সমকালীন সাহিত্য

সূচি

আবুল ফজল	: বেখাচিত্র	৬৩৫
শহীদুল্লা কায়সার	: রাজবন্দীর রোজনামচা	৬৩৭
	শপ্তক	৬৪০
আহসান হাবীব	: সারা দুপুর	৬৪৪
সানাউল হক	: বন্দর থেকে বন্দরে	৬৪৬
রণেশ দাশগুপ্ত	: শিল্পীব স্বাধীনতার প্রশ্নে	৬৫০
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্	: নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা	৬৫৩
মোহাম্মদ মোর্তজা	: প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক	৬৫৫
	জনসংখ্যা ও সম্পদ	৬৫৭
	চবিত্রহানির অধিকার	৬৫৯
নুরুল ইসলাম খান	: মেহের জুলেখা	৬৬২
হুমায়ুন কাদির	: নির্জন মেঘ	৬৬৪
আবদুর রহমান	: খোলা মন	৬৬৬
হামেদ আহমদ	: প্রবাহ	৬৬৭
দিল আরা হাশেম	: ঘর-মন-জানালা	৬৬৯
হাবীবুর রহমান	: পুতুলের মিউজিয়াম	৬৭৪
বায়াজীদ খান পন্নী	: বাঘ-বন-বন্দুক	৬৭৬
মযহারুল ইসলাম	: কবি পাগলা কানাই	৬৭৭

আবুল ফজল : রেখাচিত্র

রেখাচিত্র আবুল ফজলের আত্মজীবনীমূলক রচনা। এই বই লেখা তিনি যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স তেষট্টির ওপর। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, অনেক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হন, পারিবারিক জীবনে প্রগাঢ় আনন্দ ও সুগভীর বেদনার আস্বাদন লাভ করেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট এই জীবনের কথাই রেখাচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই বই বর্ণিতব্য কালের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস নয়। এমন কি একক জীবনের প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ানও এটা নয়। এ শুধু রেখাচিত্র। স্মৃতির আঁচড়ে আঁকা। কিছু ভুলে যাওয়া, কিছু মনের মণিকোঠায় জমে থাকা। আত্মজীবনের পূর্ণ বলয়িত কালানুক্রমিক কাহিনী বলা লেখকের মূল উদ্দেশ্য নয়। যে জীবন আজ অতিক্রান্ত তার কোনো কথা কোনো উপলব্ধি কোনো অনুভূতি অকস্মাৎ মনের মধ্যে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে, বহু পুরাতন স্মৃতি উন্মথিত হয়, বর্তমান ও অতীত কোনো অদৃশ্য সূত্রে প্রগিত হয়ে অর্থপূর্ণতা লাভ করে, ভাষা মুখর হয় চিত্রাঙ্কনে। সে ছবিও বহুবর্ণারোপের নয়। নেই এতে কাব্যময় বাক্যবিস্তার বা আত্মদর্শনমূলক তত্ত্বচিন্তা। আছে শুধু সরল ঋজু রেখার আনাগোনা। নিতান্তই সোজাসুজি করে বলা, অতি সহজ করে বলা। ছোট ছোট কথায় অতি অনায়াসে গেঁথে তোলা।

যে সকল গুণের জন্য আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা মূল্যবান হয়, গ্রন্থকারের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে সেগুলো ষোল আনা বিদ্যমান। বর্ণনার সততা, অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, প্রকাশের নৈপুণ্য সবই ছিল গ্রন্থকারের স্বভাবজ। আমাদের কালের তিনি একজন খ্যাতিমান পুরুষ। সাহিত্যিক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি সমাজের এক সুবৃহৎ অংশের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রগৌরব সর্বজনবিদিত। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষিত সমাজে যে ক্রমবিবর্তন সূচিত হয়, তার বিভিন্ন পর্ব প্রয়াস বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবুল ফজল সাহেবের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে বিবর্তনের ধারা যেমন তাঁকে গড়ে তুলেছে তেমনি আবুল ফজলের চিন্তা ও রচনা বহু স্থলে তাঁর গতিপথকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে, কোনও বিশিষ্ট পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতাই ছিল যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আবুল ফজলের ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য কথনও বারে বারে সমাকালীন সমাজ ও জীবনচেতনার স্বরূপকে উদঘাটিত করে। গ্রন্থশেষে তাঁর বিনীত নিবেদন 'এ শুধু এক সাধারণ জীবনের রেখাচিত্র, এতে অসাধারণত্বের কোনও চমক নেই।' আমরা গ্রাহ্য করি না। চমক থাকবে কেন? এতে আলো, অমলিন, অকম্পিত এবং পরিব্যাপ্ত। ওঁর শেষ-উক্তিটিকেই একটু পাল্টে বলতে পারি, সামান্য শিশিরবিন্দুতে যেমন সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়, তেমনি তাঁর জীবন-পাত্রেও যুগ-চিত্তের অতি উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে।

রেখাচিত্র চরিত্রচিত্রশালাও বটে। সম্ভবত এই গুণের জন্যই বৃহত্তম সংখ্যক পাঠক এই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আবুল ফজল সাহেবের জীবনের এক বৃহৎ সৌভাগ্য এই যে তিনি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার হৃদয়-ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। সকলের এ ক্ষমতা

থাকে না। স্মরণীয় পুরুষের নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করেও কেউ কেউ সে বিষয়ে সারা জীবন অচেতন থাকতে পাবে। আবার কারও হৃদয়ের ঐশ্বর্য এত অপাব আব জীবনপিপাসা এত সুতীক্ষ্ণ যে স্বল্প পরিচয়েও সে অন্যকে আপন করে নেয়, নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাকে আসন পেতে দেয়, তার গুণের কদর করে নিজের মনের মহিমায় সামান্য মহিমান্বিত কবে তোলে। সমগ্র বইয়ে চার শতাধিক ব্যক্তিব নামোল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকের চরিত্র বর্ণনা অতি বিস্তৃত। কারও কারও বা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সকল বর্ণনাই অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ, সরস এবং যুগ পরিবেশ-নির্দেশক। সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মজীবনীকারেরও অন্তরঙ্গ সত্তার সংবাদবাহী। শেষোক্ত কারণেই এগুলোর আবেদন এত গভীর।

আবুল ফজল সাহেবের জীবনসাধনার মূলমন্ত্র সততা। কোনো তন্ত্রমন্ত্র বা যোগসাধনার অলৌকিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি সত্যোপলব্ধি বা সত্যলাভে প্রয়াসী হন নি, প্রতিদিনের সাধারণ ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই তিনি সত্যকে খুঁজেছেন। জীবনযাত্রাব প্রাত্যহিক দায়িত্বেব মধ্যেই বিবেকের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সহজ উদার বুদ্ধিতে সত্যকে চিনে নিয়েছেন। ইসলামকে ভালোবেসেছেন অন্তর থেকে, ধার্মিকতাকে মেনে নিযেছেন স্বাভাবিক আচরণরূপে, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে কখনই ধর্মাচবণ বলে স্বীকাব করেন নি। সারা জীবনসাধনা করেছেন জ্ঞানের, জেনেছেন তিনি নিযত জ্ঞানান্বেষণেব নিববচ্ছিন্ন শ্রমেব দ্বারাই ধর্ম ও সত্য লভ্য হয, অন্ধতা ও অজ্ঞানতাব দ্বারা নয়। স্বভাবতই এই সকল গুণের চবিত্রশীলবাই সর্বাধিক মর্যাদা লাভ কবেছে বেখাচিত্রে। যেমন তৎকালীন চট্টগ্রাম মাদ্রাসাব অধ্যক্ষ শামসুল উলেমা কামালউদ্দীন সাহেবের চবিত্রচিত্রটি অথবা জনসেবক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীব অন্যতম কীর্তি চট্টগ্রামের কদম মোবাবক এতিমখানাব কথা।

একালের অনেক প্রবীণ পরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কেও বইয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। লঘু ভঙ্গীতে বড় সবস করে সেগুলো বলা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ পাঠকরা অনেক বয়োবৃদ্ধ সম্পর্কে যেসব জ্ঞান লাভ করবেন, যা তাদেব নিজের আধুনিকত্ব ও সজীবতাব অহমিকাবোধকে প্রশমিত করতে সাহায্য করবে। যেমন আজকের রাশভারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল হক ফরিদী সাহেবের তরুণ বয়সেব চিত্রটি :

> সব ব্যাপারে আবদুল হক ছিল উদ্যোগী। তার শরীরে আর মনে আলসেমি কি জড়তা যেন কোনো পাত্তাই পেত না। আমরা একটা Swimming Club বা সাঁতার সঙ্ঘও করেছিলাম। আর আবদুল হকই ছিল সে ক্লাবের দেহ আর প্রাণ দুইই। বর্ষকালে যখন বুড়িগঙ্গা কানায় কানায় ভরে উঠতো তখন কি আনন্দেই না আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আর লাগাতাম এপার-ওপার সাঁতবাবার প্রতিযোগিতা। ... কোনো চাঁদনি রাতে ... (পৃ. ১১৩)

অথবা একটি ক্ষুদ্র উল্লেখ :

> এরপর নজরুলের গজল দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা কবা হয়। নজরুল ছাড়া এ সভায় মুসলিম হলের তখনকার ছাত্র আক্কাস আলী খাঁও (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) গান করেছিলেন আর সেতার বাজিয়েছিলেন ঢাকা ইন্টাবমেডিয়েট কলেজের তখনকার ছাত্র কাজী আনোয়ারুল হক (পূর্বপাকিস্তানের প্রাক্তন আই-জি ও চিফ সেক্রেটারি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী)।

মোট কথা এই বিচিত্র চরিত্রচিত্রের সম্ভারই রেখাচিত্রের প্রবলতম আকর্ষণ। আমরাও তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থের সর্বাধিক প্রশংসা করলাম।

শহীদুল্লা কায়সার : রাজবন্দীর রোজনামচা

লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম বটে কিন্তু প্রাথমিক রচনার কোনো প্রকার অস্থিরতা, আড়ষ্টতা বা অনবধানতার চিহ্নমাত্র এতে নেই। না থাকাব কারণ এই যে লেখক পরিণত বয়স ও মনের অধিকারী 'আগে অকারণে লেখেন নি, হালে নিজের কারাজীবনের গ্লানি হরণের জন্য অকস্মাৎ গ্রন্থ রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কারাগার। 'পৃথিবীর মাঝেই আরেক পৃথিবী। এ দেশের মাঝেই আরেটি দেশ। নাম তার অচলায়তন।' অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক এই অচলায়তনের বাসিন্দাদের চিন্তাভাবনা ও চালচলন গভীর সমবেদনার সঙ্গে এই বইয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ণনার সহজতম আঙ্গিক হিসেবে লেখক দিনপঞ্জীর সরলগতিকে বেছে নিয়েছেন। আট বছরের কারাজীবনের বেদনার ভার অবশ্যই বিপুল বোঝা হয়ে মনের ওপর চেপে বসেছিল, এই আঙ্গিকের সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লেখক সেই মানসযন্ত্রণাকে অতি তীব্র গীতিকাব্যিক ভাষায় মনোহররূপে প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় এই গীতিকাব্যধর্মিতা কিঞ্চিৎ নিবারিত হলেও ক্ষতি ছিল না।

একটা ব্যাপাবে লেখক খুবই সতর্ক ছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলেছেন এবং আবেগপ্রবণতাকে কখনই এমন কোনো তত্ত্বস্রোতে প্রবাহিত হতে দেন নি যা অরাজনৈতিক বা বিরুদ্ধ রাজনীতির পাঠককে বিরূপ করে তুলতে পারে। লেখকের অপর প্রধান কৃতিত্ব, রোজনামচার আত্মভাব-প্রধান কাব্যিক আঙ্গিকের মধ্যেও তিনি প্রশংসীয় পরিমাণে গল্পনাটকের সচল ঘটনাময় জীবনবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজবন্দীর ভাবনাচিন্তা বর্ণনার প্রধান আশ্রয় হামেদ ভাইয়ের আত্মবিক্ষোভ, কালাম, খলিল, অতীশের অন্তর্জীবন এবং কারাগৃহের সভাসমিতির তর্কবিতর্ক। হামেদের জবানীতে রোজনামচা রচিত হয়েছে। কারাগারের রুদ্ধশ্বাস জীবন সহ্য করার শেষ সীমায় উপনীত হয়ে হামেদ কোনো অগ্নিময় বিস্ফোরণে ফেটে পড়েনি, কেবল আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে নিজের হৃদয় ও অনুভূতি প্রাণহীন প্রতিক্রিয়াহীন নিরুত্তাপ অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করে। 'কিছুই ভাল লাগে না। বই না। পুস্তক না। মেলা না। গল্প না।... তুই কি বুঝতে পারছিস না কোথায় চলেছি আমি; কান্না ভুলতে ভুলতে এমন করে একদিন আমি যে হাসতেও ভুলে যাব। দুঃখশোকযন্ত্রণা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা এ সব মানবীয় অনুভূতিগুলো হারিয়ে আমার কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে ?' কালাম রাজনৈতিক কর্মীর মানসিক প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে তত্ত্বালোচনার অবতারণা করে। যেমন লেখক বা হামেদও জেলখানায় অনুষ্ঠিত নানা সাহিত্যিক দিবসের মিটিংকে উপলক্ষ করে সবিস্তারে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিজের ধারণাদি ব্যক্ত করেন। এসব অংশের তত্ত্বগত বা ব্যক্তিগত সামাজিক আন্তরিকতার মূল্য যাই থাক না কেন, গ্রন্থের এগুলো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সাহিত্যাংশ নয়। যেখানে লেখক চরিত্র সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের চিত্ত স্পর্শ করেছেন, মথিত করেছেন। এ রোজনামচা আসলে চরিত্রচিত্রশালা।

সমাজজীবনে ব্যক্তি নানা রকম পেশা বা চাকরির পরিচয়চিহ্ন বহন করে। কারাগারের লৌহকপাট রাজবন্দীর জীবনে সেই পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যকে একাকার করে দেয়। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনে ছোট ছোট আচরণই তখন তাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করে। শহীদুল্লা কায়সার অস্বাভাবিক পরিবেশে নিপীড়িত মানুষের ক্ষুদ্র আচরণ ও খণ্ডোক্তির কুশলী শিল্পী। একটা সামান্য ঘটনার বর্ণনা, কারো আকস্মিক উক্তিব উল্লেখ, কোনো প্রচ্ছন্ন অভিলাষের উদ্‌ঘাটন নিমেষে রাজবন্দীর জীবনের তলদেশ পর্যন্ত আলোকিত করে তোলে, যে জীবন-চেতনাকে লেখক প্রকাশ করতে চান তাব অভিঘাত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পরীক্ষার্থী মন্টু প্লেটে করে কারাকক্ষের পায়রাকে নিয়মিত বুট খেতে দেয়; গদা পুত্রস্নেহে বিড়ালকে আদব কবেন, সিগাবেটের অভাবে রশীদ আত্মহাবা হয়, তুমি ক্লাবের মিটিংএ হাসির হুল্লোড় ওঠে, যমুনাতীরে আড্ডা জমে, সংস্কৃত সাহিত্যে উইটেব নমুনা খুঁজে না পেয়ে অতীশের অশান্তির শেষ নেই। খলিল চিৎকার করে ওঠে, 'এ্যা, একি টোস্ট, না জুতোর সুকতল্লি; মানুষের খাবার না ঘোড়ার ফডার ?' ইত্যাদি। সবাই গবমে ঘেমে অস্থিব, কিন্তু ফকীর ভাই, যিনি রাজনীতি কবেন কেবল মন্ত্রিত্বেব অভিলাষে, জেলে এসেই কেবল মাত্র নিজের জন্য একটা বিজলী পাখার ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি প্রায় নিতম্ব অবধি লুঙ্গিটাকে গুটিয়ে এনে শুয়ে রয়েছেন, শো শো করে পাখাটা ঘুবছে মাথাব ওপব।

পূর্ণতর চরিত্র সেলিম ভাই, খলিল এবং খলিলেব পত্রলেখিকা পত্নী তাহমিনা। বন্দী খলিলের জীবন দুর্বিসহ হয় পত্নীর পত্রাঘাতে। কারাগাবের বাইরে নবজাতক শিশুকে একাকী বুকে জড়িয়ে ধরে এই সাধারণ স্বাভাবিক রমণী বিচ্ছেদের বেদনা ও গ্লানি [illegible] করতে না পেবে খলিলকে ক্রমাগত পত্র লিখে চলে :

> কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে তুমি পড়ে থাক জেলে; তোমার বৌ তোমাব ছেলে অপরের আশ্রয়ে অপরের অন্নে কোনও বকমে জীবন ধারণ করে চলছে। এতে কি তোমার পুরুষ মর্যাদা খুব বাড়ছে মনে কর, বলতে পার আপন ভাই আপন বোন ওরা কেন পর হয়ে যাবেন ? মানলাম। কিন্তু লজ্জা সরম তো আমার লোপ পায় নি এখনো। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বছরের পর বছর কেমন করে আমি হাত পাতি ওদের কাছে ?... ওরা শুধায় স্বামী কী করেন, কতো মাইনে ? এর জবাবে কী বলব আমি ? আমি কি বলব, স্বামী রাজবন্দী, আহার-বাসস্থান ফ্রি, মাইনে ? রাজবন্দী স্বামীর পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করবে, দুঃখী হয়েও সুখ পাবে, অনাহারী থেকেও তৃপ্তি পাবে তেমন মেয়ে বিয়ে করনি তুমি।...

সেলিমভাইয়ের মনের ওপর আঘাত এত গুরুতের হয়েছে যে, তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। নিজের বৌ যে নিঃসন্দেহে একটি ছিনাল এ কথা মধ্যরাতে অন্য রাজবন্দীকে ঘুম থেকে তুলে মশারি উল্টে ফিসফিস করে বলতে থাকেন। একদিন :

> ঘরের ভিতরে সেই একই দৃশ্য : এ মাথা ও মাথা দ্রুত হেঁটে চলেছেন সেলিমভাই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় হাঁটছেন না, কী যেন জরুরি কাজে দৌড়াচ্ছেন।... সেলিমভাই হাঁটছেন আর ডান হাতের তালু দিয়ে ক্রমাগত ঘষে চলেছেন মাথার টাকটা।...মন্টু...চেঁচিয়ে উঠল, সবে ত বেলা নয়টা, গোসল করবেন সেই বারটায়, এক্ষুনি মাথায় তেল ঘষতে শুরু করেছেন সেলিমভাই ? থক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেলিমভাই। সাপের চোখের মতো ভয়ংকর দুটো চোখ কী এক জান্তব হিংস্রতায় ধরে

রাখলেন মন্টুর ওপর। চমকে উঠলাম। সেলিমভাইর চোখের ক্ষেত জুড়ে চারাগাছের শিকড়ের মতো সরু সরু অজস্র রক্তাক্ত শিরা। সেই রক্তাক্ত শিরাগুলো ছিঁড়ে যেন বিষের অনল ঝরছে। এক পা-দু-পা করে মন্টুর সিটের দিকে এলেন সেলিমভাই। কাছে এসেই ফেটে পড়লেন, কী বললে ? আমি তেল মাখছি। ডু আই অয়েল দ্যাট সন অব এ বিচ ? নো নেভার। কোনো শালার তেল মাখিনে আমি। কোনো ব্যাটার তোয়াক্কা করিনে আমি। সেলিমভাই ততক্ষণে অদূরে পুষিদের পরিচর্যারত গদাকে নিয়ে পড়েছেন। ... ল্যুক এ্যাট দ্যাট ম্যান। বয়স পয়ষট্টি বছর। এর মাঝে তিরিশ বছর জেলেই খেটেছে। সেই ইংরেজ আমল থেকে জেল খাটছেন। সো হি থিংকস হি ইজ এ ভ্যালিয়েন্ট প্যাট্রিয়ট। ভাবখানা, এত জেল খেটেছে, আমার দেশপ্রেমে কার সন্দেহ ?— কিন্তু গদা লেট আস বি ফ্রাংক, আই কান্ট অয়েল ইউ এনি মোর। দ্যাট ইজ ফাইনাল।... গদা আমি বলছি— গেট ইওরসেলফ রেডি। তৈরি হোন। মোমেন্ট অব ট্রুথ, আপনার আমার জীবনে পরম সত্যের লগ্ন আজ সমুপস্থিত। তৈরি হোন, চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য। আমি রেডি গদা, আপনি তৈরি ?

বই ত্রুটিহীন নয়। লেখক নিজেও হয়তো দ্বিতীয় চিন্তায় তাঁর অনেকগুলো অনুভব করতে পারবেন। আমরাও কিছু কিছু আভাস দিয়েছি। কোনো কোনো স্থান ভাবলুতায় আচ্ছন্ন, কোনো কোনো ঘটনা অতিনাটকীয়তায় দুষ্ট (যেমন হিমার প্রসঙ্গ) রাজবন্দীর জীবনালেখ্য রাজনীতি বিবর্জিত হওয়াতে আবেদন স্বদেশে অবাধ এবং দূরবিস্তারী হয়েছে বটে কিন্তু বর্ণিত মানুষ সকল সময় শক্ত জমিনে শিকড় গেড়ে সতর্ক পাঠকের বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। তা হোক। পূর্বপাকিস্তানি কারাগার এই প্রথম এক শিল্পীর জন্ম দিয়েছেন, আমরা তাঁর ক্রম প্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করব। ইতোমধ্যেই লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ, উপন্যাস 'সারেং বৌ' আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আগামীতে তার গুণাগুণ বিচার করবার সদিচ্ছা রইল।

শহীদুল্লা কায়সার : সংশপ্তক

সংশপ্তক শহীদুল্লা কায়সারের দ্বিতীয় উপন্যাস। আয়তনের তুলনায় এর ঘটনাকাল বা ঘটনাক্রম অসাধারণ রূপে পরিব্যাপ্ত বা অতিজটিল নয়। মোটামুটি দশ-বারো বছরের ঘটনাধারা এতে চিত্রিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার বছর দশেক পূর্ব থেকে শুরু শেষে পাকিস্তান লাভের দু'এক বছর পর। প্রথম থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাহিনীর পট গ্রাম, বাকুলিয়া তালতলি। বাকি অংশে, প্রথমে কোলকাতা, পরে ঢাকা।

মূলত বাকুলিয়ার সৈয়দ সন্তানরাই কাহিনীর ধারক ও বাহক। সৈয়দদের বনেদি গ্রামীণ মুসলিম পরিবার। প্রাচীন প্রথাবদ্ধ সংস্কারানুসরণ এবং ধর্মানুশীলনের ধারার সঙ্গে নবীন ইংরেজি শিক্ষার ও সরকারি চাকরির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস সবে এক পুরুষ থেকে শুরু হয়েছে। লেখকের ভাষায় : 'দীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আব াস্তবের পৃথিবী এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দ-বাড়ি। চল্লিশের ওপরের মহিলারা সবাই হজ্ব সেরে এসেছেন। কর্তা সৈয়দ দু'দুবার হজ করেছেন। নিজের ইংরেজি ডিগ্রি আর ইংরেজের আপিসে বড় চাকরিটার সাথে লম্বা দাড়ি, লম্বা কোর্তা আর মদিনা শরিফের গোলটুপির লেবাসটটোক অতি সহজে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি।' কর্তা সৈয়দ সাহেব থাকেন শহরে, কর্মস্থলে; সৈয়দ-গিন্নি এবং কন্যা আরিফা থাকেন গ্রামের বাড়িতে। ছেলে জাহেদ কলেজে পড়ে, রাজনীতি করে, কালেভদ্রে গ্রামে আসে। কর্তা সৈয়দের ছোটভাই কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। দেশী বিদেশী, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, কত বিদ্যে তার। সেই মানুষ, হঠাৎ কী যেন কী হয়ে গেল, তাজা বউ আর তিন মাসের মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।... কোথায় কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে লোকটা, আজ যদি খবর আসে নোঙর ফেলেছে বেরেলীতে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চলে গেছে দেওবন্দে। হঠাৎ হয়তো খবর পাওয়া গেল বড় পির সাহেবের মাজার জিয়ারতে গেছে বোগদাদে, সেখান থেকে কারবালায়। শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সংসারত্যাগী দরবেশ বনে আস্তানা নেন মাইজ ভাণ্ডারীদের ডেরায়। স্ত্রী মরে গেছে, কন্যা রাবু মিশে গেছে চাচির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিশোর মালু এই বাড়িরই এক আশ্রিত ছেলে। বাপ মুন্সিগিরি করে, মা সংসারের ফুটফরমাস খাটে। মালু রাবুকে বলে রাবু আপা, আরিফাকে বড় আপা। আপারা বারো চোদ্দয় পড়ে, পর্দার কড়াকড়িতে গৃহাবদ্ধ হয়। মালু তাদের সাহায্য করে নিয়ম ভাঙতে, মুরব্বিদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি। মালুর শৈশব থেকে ঝোঁক পালাগান শোনার, নিজের গলায় গান তোলার।

জাহেদ ভাই গ্রামে আসে, অল্পসল্প আদর্শবাদী সেকান্দর মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে, মুসলমান জনসাধারণকে আজাদি লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নানা অঞ্চলে সভাসমিতি করে বেড়ায়। মালুও সঙ্গ নেয়, সে গান গেয়ে শোনায়। তার অনুপ্রেরণার এক উৎস সেকান্দর মাস্টারের ছোট বোন বালিকা রাণু, অন্যজন পার্শ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান গ্রামের মেয়ে রাণুদি। গ্রামজীবনের পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের আনাগোনায়।

এরা হলো, আভিজাত্যাভিমানী হৃতবিত্ত ফেলু মিঞা, তার কুকর্মের দোসর কানকাটা রমজান, বলবান রূপবতী যুবতী ব্যভিচারিণী হুরমতি।

সৈয়দ পরিবারের অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় যেদিন দরবেশ চাচা অকস্মাৎ তার সাধনভজন-মগ্ন কম্বলধারী ভাণ্ডারী মোর্শিদদের নিয়ে বাড়ি চড়াও হলেন এবং রাতারাতি এক প্রকার জবরদস্তি নিজের একমাত্র কন্যা লজ্জানম্র ভীত-সন্ত্রস্ত কিশোরী রাবুর সঙ্গে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশালদেহী বুজর্গের সঙ্গে শাদি দিয়ে দিলেন। সকাল বেলা বাড়ি ফিরে সাধনভজনরত দরবেশদের কাণ্ডকারখানা দেখে জাহেদ অবাক হয়ে যায়। কিন্তু সব কিছু জানার পর নিজের কর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব করে না। ডাক দিতেই লাঠিসোটাসহ লেকু দলবল নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জাহেদের নির্দেশে বলপ্রয়োগে দরবেশ চাচা, বুজর্গ জামাতা এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের গ্রামছাড়া করে। ধস্তাধস্তিতে জাহেদও সামান্য আহত হয়। জাহেদের এই বাড়াবাড়িতে বাড়ির এবং পাড়ার অন্যান্য মুরব্বিরা তার চেয়ে বেশি আহত হন মনে। মনে এমন কি রাবু পর্যন্ত জাহেদকে অপরাধী মনে করে এইজন্য যে সে তার পিতাকে অপমান করেছে। রাবুর মতে তার ললাট লিখন ধর্মানুমোদিত হলে তা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা জাহেদের পক্ষে অন্যায়, তার নিজের জন্য অমঙ্গলকর।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। আরিফা-জাহেদদের সঙ্গে রাবুও শহরে চলে আসে। নিরন্ন জনতা গ্রাম ত্যাগ করে অন্নের সন্ধানে। মালুও নানা ঘাটে শিক্ষালাভ করে শেষে গিয়ে হাজির হয় কোলকাতায়। প্রথমে, সঙ্গীতানুরাগী আশোকদার মেসে; পরে, আশ্রয় নেয় পল্লীগীতি সম্রাট রকিব সাহেবের ঘরে। দাঙ্গায় বিধ্বস্তা মহানগরীতে সে গিয়ে আবার মিলিত হয় সৈয়দ পরিবারের সঙ্গে, আরিফার তখন বিয়ে হয়ে গেছে পয়সাওয়ালা এক ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। রাবু পড়ে কলেজে, যোগ দেয় মিছিলে, মেতে থাকে জনসেবায় জাহেদের কর্মসহচরী রূপে। রাবুর নিজের মুক্তি নিজের কাছে স্পষ্ট হল, যেদিন সে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুজর্গ আলহাজ শাহসুফি গোলাম হায়দার মোজাদ্দেদিকে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অকল্পনীয় দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পতিত্বের অধিকার দান করতে সরাসরি অস্বীকার করল। রাবু উপলব্ধি করল যে দেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জাহেদ ভাই হয়তো পতিরূপে প্রাপনীয় নয়, হয়তো কাম্যও নয়, তবুও সেই প্রেমেই আজীবন মগ্ন থেকে তাকে জীবনের ঋণ শোধ করতে হবে। রাবু ফিরে যায় গ্রামে, ঘরে ফিরে আসা দরবেশ পিতার সেবা করতে এবং গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয় গড়ে তুলতে। এদিকে মালু ক্রমে গভীরভাবে মহানগরীর মোহাবিষ্ট হয়। বেতার গায়ক রূপে খ্যাতি অর্জন করে রূপসী রিহানাকে বিয়ে করে অসুখী হয়।

কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে তালতলিতে, যেখানে আবার সবাই একত্রিত হয়েছে। মহামারীতে আক্রান্ত গ্রামবাসীর সেবা করতে গিয়ে রাবুও বসন্তের কবলে পড়ে। মালু জাহেদ এবং হুরমতির সেবায় যখন সে আরোগ্য লাভ করল তখন পুলিস এসে পড়েছে, আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী জাহেদকে গ্রেপ্তার করবে বলে। এইখানেই কাহিনীর শেষ।

এতবড় বিস্তৃত সাম্প্রতিক পটভূমিতে এরূপ একটি পরিপূর্ণ কাহিনী এ যাবত পূর্বপাকিস্তানি কোনো উপন্যাসে এতটা সার্থকতার সঙ্গে রচিত হয়নি। আজকের যে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিবর্গ পূর্বপাকিস্তানি জীবনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ

অধিকার করে আছে, যাদের আকাঙক্ষা বাসনা প্রত্যহ অন্তহীন সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত, তাদের চেতনা তলদেশ কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে, স্থূলতা, কার্যত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে জর্জরিত গ্রামজীবনে বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে, সহস্র শিরা-উপশিরার নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে প্রথিত সেই সত্যই যেন লেখক সংশপ্তকে উদঘাটিত করতে তৎপর হয়েছেন। নাগরিক জীবনে সাফল্য অর্জনে উদ্যোগী আজকের কর্মলিপ্ত মধ্যবিত্তের উন্মেষ তার উত্থান-পতনের লীলা এবং অবশেষে তার এক বিশিষ্ট পরিণাম সবই যেন লেখক জ্বলন্ত অভিজ্ঞতারূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং তাকে এক সুদীর্ঘ কিন্তু মনোজ্ঞ গল্পাকারে সুসজ্জিত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রচলিত পূর্বপাকিস্তানি উপন্যাসের ধারায় তাঁর এই শিক্ষাগত সাফল্য সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবিদার।

উপন্যাসটি যে সর্বাংশে ত্রুটিহীন তা নয়। অতি দীর্ঘ রচনায় সর্বত্র উৎকর্ষের সম্মান রক্ষা করা যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই দুরূহ কর্ম। সংশপ্তকের প্রথমার্ধ শেষার্ধের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। গর্ভবতী হুরমতি শাস্তি স্বরূপ তার কপালে অগ্নিদগ্ধ তামার পয়সা ছ্যাকা দেয়ার দৃশ্য, ধর্ষিতা হবার পূর্বমুহূর্তে সেই বিবস্ত্রা রমণী কর্তৃক রমজানের কর্ণ কর্তন, মুগুরাঘাতে জাহেদ কর্তৃক কম্বলধারী ভজনাকারীদের বিতাড়ন ইত্যাদি দৃশ্য গ্রন্থে যতটা প্রভাময়, নগরজীবনের প্রেমোপাখ্যান বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড, এমন কি দাংগার মর্মন্তুদ ঘটনাদি পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে তেমন কোনো বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নি। তবে, এ সব কিছু গৌণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা শহীদুল্লা কায়সারকে, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে নিষ্পন্ন অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হালে পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যে বাংলা গদ্যরীতির যে পরিবর্তন ধারা সুচিত হয়েছে তার এক কোটিতে রয়েছে বর্তমান মুসলমান সমাজে প্রচলিত বা অতীতের পুঁথিসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দ গ্রহণের প্রতি প্রবণতা, অন্য কোটিতে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক বুলির ঐশ্বর্যকে সাহিত্যিক গদ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার প্রয়াস। ভাষার শিল্পগত মূল্যায়নের দান উভয় পর্যায়ের নির্দেশনই শহীদুল্লার গদ্যে বিদ্যমান। তবে ভাষার শিল্পগতমূল্যায়নে এ সবই বাহ্য লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, এমন কোনও বিশেষ আরবি-ফারসি শব্দ বা আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গী নেই যা আত্যন্তিকভাবে সুন্দর বা কুৎসিত। ব্যবহারে যখন তা বিশিষ্টতা অর্জন করে, দ্যোতনায় যখন তা অমোঘ বলে প্রতীয়মান হয় তখনই আমরা তা সার্থকতা স্বীকার করে নেই। সে শব্দ বা বুলির উৎসগত জাতবিচার তখন অহেতুক মনে হয়। শহীদুল্লাব রচনার নানা প্রকার নতুন শব্দ, শব্দগঠন ও বাক্যাংশের তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন আমাদের মনে সাড়া জাগায়। পূর্ববংগের যে বিশেষ অঞ্চল তাঁর কাহিনীর পটভূমি, সেখানকার মুখের বুলিতে এক প্রকার বেগবান প্রবলতা ও প্রচণ্ডতা আছে। আরবি-ফারসি শব্দের মিশালও প্রচুর। তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধবাদীদের কাছে মনে হতে পারে যে, সে সব ভাষার অনেক কথাই, কলমে তোলা দূরে থাক, কানে পর্যন্ত দেয়া যায় না। শহীদুল্লাহ কায়সার বাস্তববাদী শিল্পী, বিশুদ্ধাত্মা নন। আমার বর্ণনা থেকেও অনুমেয় যে সংশপ্তকে এমন অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা আছে যা সলজ্জ হৃদয়ে পাঠ্য নয়। যেমন বিষয়ের রূপায়ণে, তেমনি ভাষার গঠনকর্মেও শহীদুল্লা কুণ্ঠাহীন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম তিন চরণই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পরিবেশ অনুযায়ী আঞ্চলিক বা আরবি-ফারসি শব্দ নির্বাচনে তার লেখনী বড়ই তৎপর।

আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি :

> 'পথে পথে চেয়ে মেংগে খান। দিলে তার সদমা এল। পেট ত রীতিমতো কুলহুয়াল্লা পড়ছিল। ওরা তখন বেদিশা। হার্মাদি শুরু করে। কহর দেয়। বেধে গেল তুল কালাম বহস। বয়স আর সুখের ভারে বেশ ওজনী হয়েছেন সৈয়দ গিন্নি। রোয়াব নেই। সোর মচিয়ে। হয়রান মানে। গাঁটরি লয়ে। ছুট দেয়। পুলক পায়। মাছের খোড়ল, করই ভাজি, ঘরের কেবাড়, কসবি, জারবা, কাউয়ের কোয়া, দাদাপিজার দিনে।'

আহসান হাবীব : সারা দুপুর

'সারা দুপুর' আহসান হাবীবের নতুন কবিতার বই এবং চলতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসাবে আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত। এতদসত্ত্বেও একথা বলার অবকাশ হয়তো আছে যে আলোচ্য গ্রন্থটি আহসান হাবীবের কবিকীর্তির শ্রেষ্ঠ নির্দশন নাও হতে পারে। না হোক। তবু 'সারা দুপুরে'র যা মূল্য তা অকিঞ্চিৎকর নয়। একাধিক কবিতায় আহসান হাবিবের বিশিষ্ট কবিমানসের পরিচয় এত অন্তরঙ্গরূপে উন্মোচিত যে তার সংস্পর্শে আমাদের চেতনাও ক্ষণকালের জন্য বেদনায়, অস্থিরতায়, উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে। আহসান হাবীবের কবিতার সারও এই অনুভূতির লীলা। তত্ত্ব নয়, প্রজ্ঞা নয়, উচ্চমার্গীয় সূক্ষ্ম চিন্তার উর্ণা নয়, আহসান হাবীবের কবিতার প্রাণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির এক মৃদু মধুর বিষণ্ন মন্থর প্রবাহ। আহসান হাবীবের কবিতার ভাষারও এই রকম ঐশ্বর্য। আপাতসরল শব্দ ও বাক্যের সম্মোহনে ভাবন চরণে-চরণে দোল খায়, আনুষঙ্গিক অর্থের তীর্যক দ্যোতনায় তার রূপ বদলায়, একই আবেশ শতচক্রে আবর্তিত হয়। উপলব্ধির মর্মকোষে প্রবেশ করার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি, রাবীন্দ্রিক সমালোচনার পবিভাষায়, অবিরত রূপ থেকে ভাবে, ভাব থেকে রূপে আসা-যাওয়া করেন। এই বলেন পুতুল, একটু পরেই তাকে ডাকেন রানী বলে,

পুতুল যদিও
তবু
হেমন্তের বিকেলের রোদে
মুখ মুছে
        নিজ হাত তুলে নেয়
সোনামাখা ধানের মঞ্জরী দু'চারটি
যদিও পুতুল।...
পুতুল।
        এখন তার সম্রাজ্ঞীর মতন মহিমা!
শৈশব কৈশোর আর যৌবনের সারা পথ হেঁটে
        অবশেষে
সে এখন একযুগ সভ্যতার উজ্জ্বল আকাশ!
পুতুল বলি না তাকে
যদিও সে আদিম পুতুল।
রানী বলি
        কেননা সে প্রাণের পুতুল।

আহসান হাবীব যতটা জীবন বা সমাজের তার চেয়ে অনেক বেশি মনের কবি, মানসিকতার কবি, মানসাভিসারের কবি। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের বহু ব্যর্থতা ও পরাজয়, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন আহসান হাবীবের কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু তার প্রকাশ প্রায়শ স্থূল মৃত্তিকার গণ্ডি অতিক্রান্ত, রূঢ় বাস্তবতার সম্পর্ক বর্জিত। সবটাই আভাসেরূপকে, ইংগিতেরহস্যে,

ক্বচিৎ কখনো মৃদু বিদ্রূপেকটাক্ষে লীলায়িত। যেমন,

সামান্য সঞ্চয় ঘর থেকে যা এনে
দিয়েছি বিলিয়ে
তার পায়ে—
নতুন যৌবন বিলিয়ে তৃষ্ণার তীব্র
আগুন জ্বালিয়ে
যে নাগরী নারীয় সম্পান
ঘাটে ঘাটে
নুপুরের ধ্বনি তোলে।...
মনে পড়ে
আর জানে মন,
এই অবারিত দ্বার
প্রেক্ষাগারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগবে; এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

ভালো লাগে যখন কবির এই নির্জন নিঃসঙ্গ আত্মবিলাপ দেশজ প্রকৃতির কোনও গুঢ়তম সত্যকে আশ্রয় করে, তার শক্তিকে শব্দের নিবিড় বন্ধনে নিপীড়িত করে যেমন,

আমার
সব গেছে, ঘাটের ময়ূরপক্ষী গেছে আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা
ভাতে বসে না কাক,...
মনে হয়, শেষ শিখা সর্বশেষ ঝড়ে
নিভে যাবে, আমি নিভে যাবো। আমার
সমস্ত বুক জুড়ে
যত প্রাণ বেচে আছে আর যত সুরের প্রলেপ
এখনো জারুল আর জামরুলের পাতায় মর্মর
তোলে কিছু
সব যাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে।
এ নদী তখন কোনো সরীসৃপ শরীরে মৃত্যুর
অন্ধকার হয়ে রবে।

সারা দুপুরের মধ্যে এই বেদনার উদ্বেলতাই মুখ্য। এই বেদনা কখনও নিদাঘের দ্বিপ্রহরের অতলান্ত শব্দহীন গভীরতাকে স্পর্শ করে, কখনও তার উত্তাল হাওয়ায় মর্মরিত পত্রের হাহাকারকে মূর্ত করে তোলে। কবির এই বিষণ্ণতা যদি আরও কারণিক হত, স্থূলতর সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যদি কোনো অদৃশ্য সূত্র গ্রথিত থাকতে পারত, অন্তত সেই পটের স্মৃতি পাঠকের মনে জাগরিত রাখবার তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যোপায় উদ্ভাবন করতে পারত, তাহলে 'সারা দুপুর' মহত্তর কাব্যে পরিণত হত।

'সারা দুপুরে'র সূক্ষ্মস্নিগ্ধ কবিকল্পনার মর্যাদা, প্রকাশনার মনোমুগ্ধকর পারিপাট্য ও সৌন্দর্য সর্বাংশে রক্ষা করছে।

সানাউল হক : বন্দর থেকে বন্দরে

ভাল ভ্রমণকাহিনী লেখা ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। আগে যত সহজে বিদেশ দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে অবিমিশ্র হর্ষ ও বিস্ময় উৎপাদন করা সম্ভব ছিল এখন আর তা করা যায় না। গোটা দুনিয়া এখন বহুলোকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। চেনা মানুষরাও হিল্লি দিল্লি পেছন ফেলে বিলাত আমেরিকা, চিন জাপান, ইরান তুরান, রুশ তুরস্ক, মালব আফ্রিকা ঘুরে স্বদেশে ফিরে এসে নিরিবিলি ঘর-সংসার করছেন। অবশ্য সকলের স্বাভাব এক রকম নয়। অনেকেই প্রত্যাবর্তন করেই গ্রন্থ রচনায় মেতে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বপাকিস্তানে ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা সাম্প্রতিককালে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সামনে বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা আমাদের যে অনুপাতে বেড়ে চলেছে এবং ভ্রমণান্তিক ক্লান্তি অগ্রাহ্য করে আমবা যে নিয়মে গ্রন্থ রচনায় মেতে উঠেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে, পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে ট্রাভেলগের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

একদিক থেকে বিচার করলে ট্রাভেলগ রচনা করা খুব সহজ। নিজেব মাথা থেকে কোনো কাহিনী বা চরিত্র উদ্ভাবন করতে হয় না, উপন্যাসের বাঁধা সড়ক দিয়ে চলতে হয় না, কল্পনা অনুপ্রেরণার বশ্যতা স্বীকার করতে হয় না। কেবল স্বচক্ষে যা দেখেছি, স্বকর্ণে যা শুনেছি এবং আপন মনে যা ভেবেছি তা বিরামহীনভাবে লিখে গেলেই হল। বেশি ভেবে-চিন্তে লেখা হয় না বলে সাধারণ পাঠকরাও এগুলো নির্ভাবনায় পড়তে পারেন, অনায়াসে দূর দেশের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলেন মনে করে পুলকিত হন এবং সেই প্রসঙ্গে সমমানের চিন্তার মুদ্রিত প্রকাশ লক্ষ করে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। সজাগ প্রকাশকরা যখন আরও লক্ষ করেন যে, আইএ বিএ ক্লাসের অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থের তালিকায় একটি করে ভ্রমণকাহিনী পাঠের স্থায়ী ব্যবস্থা করে বাখা হয়েছে তখন তারাও এগুলো তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। লেখাপড়া জানা যে-কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এরকম অবস্থায় দেশভ্রমণ সমাপনের পর গ্রন্থ রচনার লোভ ও প্রবৃত্তি দমন করা সত্যি কঠিন।

অবশ্য সকল ভ্রমণ কাহিনীই যে এই শ্রেণীতে পড়ে তা নয়। এর মধ্যে তিন-চারখানা এমনও রয়েছে যা শিল্পকর্ম হিসেবে উৎকৃষ্ট। ভাল ভ্রমণকাহিনী হবেও তাই। ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যেরই একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ, কেবল জাহাজ হাওয়াই জাহাজের সময় তালিকা এবং ভূ-পৃষ্ঠেব মানচিত্রের সংকলন নয়। বহুল পরিমাণ নতুন সংবাদ এতে অবশ্যই প্রত্যাশিত কিন্তু তা পরিবেশিত হবে বিশিষ্ট ব্যক্তিমানসের সরস উপলব্ধির দ্বারা পরিশোধিত হয়ে। কিছু কথা বলা হবে, কিছু বলা হবে না। উক্ত অনুক্তের কৌশলের পরিচর্যার ফলে পাঠকের অন্তবে বিদেশ স্বদেশে পরিণত হবে, স্বদেশ ব্যাপ্ত হবে চরাচরে। হয়তো সব কিছু লুপ্ত করে ভাস্বর হয়ে থাকবে শুধু ভ্রমণকারীর চিত্ত যা একক এবং নিঃসঙ্গ হয়েও বিশ্বের মুকুর। আধুনিক ভ্রমণকাহিনীতে আমরা এই রসেরই অনুসন্ধান করি। গুরুভার তথ্য নয়, তথ্যের

ইশারা; অক্ষ-দ্রাঘিমার নির্দেশ নয়, ঠিকানার নিশানা থাকলেই চলে। ভূগোল নয় খুঁজি মানুষকে, ব্যক্তিকে। বৃত্তান্ত যখন ব্যক্তির অন্তরঙ্গ হয় তখন মনে সাড়া জাগায়। বর্ণনাকারীর চিন্তা ও চরিত্রের ঐশ্বর্য, তার অনুভূতি ও উপলব্ধির সম্ভার রচনার অদৃশ্য কলাকৌশলের সাহায্যে নিজেকে যতটা উন্মোচিত করতে সমর্থ হয় ঠিক ততখানিই সেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ্য।

বন্দর থেকে বন্দরে বহুলাংশে সুপাঠ্য একটি মূল্যবান ভ্রমণকাহিনী। লেখক কয়েকজন সহকর্মী-সহ কয়েক মাস ধরে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর-বন্দর পরিদর্শন করেন। দলের সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিদগ্ধচিত্ত। সকলেই নাগরিক চেতনাপুষ্ট এবং রসিক। বর্ণনার নানা পর্বে এদের আবির্ভাব লেখকের চেতনাকে উদ্দীপিত করে রচনার রস সম্পাদনে সহায়তা করেছে। লেখক নিজে ভাষার সুদক্ষ কারিগর, তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিচক্ষণ সমাজবিজ্ঞানীর, তাঁর মানস প্রকৃতি কবি ও ভাবুকের। তিনি যা যা দেখেছেন তার সব কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ করেননি, কেবল যা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে মনের মণিকোঠায় তাকেই ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় ভাবনার আলোড়নই রচনায় এত বড় হয়ে ওঠে যে তার উদয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক কারণটা নিতান্ত গৌণ এবং তুচ্ছ বলে মনে হতে থাকে। এই বই ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশ হওয়ার যোগ্য নয়। পরবর্তী কোনো বিদেশযাত্রীর জন্য এতে কার্যকর পথনির্দেশ বা পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এখানে ভৌগোলিক অস্ট্রেলিয়া যতখানি উদ্‌ঘাটিত তার চেয়ে অনেক বেশি উন্মোচিত গ্রন্থকারের ব্যক্তিসত্তা, যিনি একাধারে কবি, বিদ্বান, রসিক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। নাম যাই হোক না কেন, বন্দর নয় নাবিকই এই গ্রন্থের প্রাণ।

সানাউল হক যে একেবারেই ট্যুরিস্ট নন তা নয়। টুওয়োম্বা ক্যানেবেরা সিডনি মেলবোর্ন শহর-বন্দর, পারমাট্টা কি সোয়ান নদী, ওয়াটল ফুল কিম্বা ব্লু মাউন্টিনের তিনি যথেষ্ট রূপে বিস্তৃত ও যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে মুক্ত মন বেশিক্ষণ তথ্যের তালিকায় আবদ্ধ থাকতে রাজি হয় না। এমন লোকের দেশভ্রমণের ধারণাও আলাদা। 'ভ্রমণ আর ট্যুরিজম ঠিক এক নয়। ভ্রমণের মধ্যে গমনেব স্বাদ, ঘর ছেড়ে মাঠে বেড়ানোর যেমন অন্যতর আনন্দ। ট্যুরিজম, যে কোনো ইজমের মতো অস্থির হাঁস-ফাঁস, অতি দেখার আগ্রহ বিলাস।' তাই মন ছুটে যায় পারমাট্টা নদীতে দমকা বাতাসে উড়ে যাওয়া বন্ধুর বিলাতি টুপি খোঁজে, ধিক্কার দেয় মেলবোর্নের স্যাঁতস্যাঁতে বিলাতি আবহাওয়াকে, রঙ্গ করে নব বিবাহিতের প্রবাস জীবন নিয়ে, উৎকণ্ঠিত হয় কোনো বিরহিণী বিদেশীর জন্য। 'বন্দরে বন্দরে এমনি কত মুখের দর্শন, কত মানস তর্পণ এবং কত না মনের স্পর্শন।' ক্রমাগতই ভ্রাম্যমাণ মানস বিষয়ের সামান্যতমসূত্র আশ্রয় করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ভেসে বেড়ায়। হয়তো কোনো সহযাত্রীর প্রবল রসোল্লাস দেখে লেখক বিমর্ষ হন। মন্তব্য করেন—

> এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা সূক্ষ্ম রসানুভূতিও নিঃশব্দে উপভোগ করতে পারেন না। কাব্যে ও গানের আসেরও তারা দাঁত বার করে হাসেন, গলা ফাটিয়ে বাহবা দেন। আপনি যদি চুপ থাকেন, হয়তো কাঁধে এমনি ঝাকুনি দেবেন যার অর্থ, সাড়া দিচ্ছ না যে, নেশা করেছে না কি ?

আত্মগত চিন্তার অনুরূপ প্রকাশ সমগ্র বইয়ে অজস্র ছড়ানো রয়েছে। বন্দর থেকে বন্দরে যে

এত সুপাঠ্যতার মুখ্য কারণও এগুলোই। নমুনা স্বরূপ আরও কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> জাহাজের লেখকের চিন্তা আপন মনে দোল খায় :
>
> সমুদ্রযাত্রা আসলে যাত্রাই নয়, গতিশীল গৃহবাস। দেহ-মন এলিয়ে দেবার রম্য পরিবেশ। কাস্টমস আওতা-বহির্ভূত ভাসমান সমুদ্রবক্ষে সিগ্রেট (এবং সুরা) জলের দরে বিকোয়।

চোখ খোলা রেখে ঘুরে বেড়ালে পদে পদে স্বদেশের সঙ্গে নানা প্রতিতুলনা মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য খাদ্যতালিকার একঘেঁয়েমি অসহ্য মনের হবার কারণ,

> ঋতুতে ঋতুতে নতুন মাছ, নিত্য নতুন তরিতরকারির সঙ্গে বদলায় আমাদের খাদ্যতালিকা। বর্ষায় যা ঘটা করে খাই, শীতে তা পাতে নেই না। সংসার দরিদ্র হলেও সম্ভ্রান্ত আমাদের খাদ্যরুচি।

বিদেশে বৃদ্ধদের উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ জীবন লক্ষ করে মনে ভাবনা জাগে,

> এখানে ভোগপ্রমত্ত জীবনে ঝামেলার দুর্ভোগ পোয়াতে কেউ রাজি নয়। প্রতি রাত্রে যাদের রয়েছে ক্লাব ডিনার বা সিনেমা, শনি-রবিতে যাদের ছুটতে হয় সি-বিচে, পর্বত শিখরে বা পিকনিকে, বুড়ো বাবা-মা-দাদা-দাদির দিকে পিছন করে তাকানোর তাদের সময় কই। যৌবন আনন্দ মুখের দৈনন্দিনকে এরা কখনো জড়তার সংস্পর্শে ব্যথাতুব করতে চায় না।... সম্মুখাভিসার পথে গুরুজনদের আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের চলে না। সামনে আমরা যতই এগোই পেছনের বন্ধন হয়তো শিথিল হয়, কিন্তু আলগা হয় না। যোগসূত্রের দূরতম সম্পর্কটুকু টিকে থাকে। আমাদের চলার পথে তাই প্রচুর মানা নিষেধ, অনেক বন্ধন ক্রন্দন। আমরা গুণে গুণে পা ফেলি, ধীরে সুস্থে এগোই। যুবা বৃদ্ধ আমরা যৌথ কারবারে বিশ্বাস। যৌবনের প্রোপ্রাইটারশিপের চেয়ে আমরা বার্ধ্যক্য ও যৌবনের পার্টনারশিপেই বিশ্বাসী। ফসকে যেতে পারিনি বলে আমরা টকে এগোতে পারিনি।

আবার পশ্চিম দেশের মানুষকে যখন অকাজে মাতোয়ারা হতে দেখেন তখন লেখক তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন :

> কর্মবিমুখতা নেই বলে রোনোদের মর্মব্যথা কম। কাজের বিরাগ নেই তাই অকাজে এদের এতো অনুরাগ। হালাল রুজি করে বলেই ছুটির পুঁজি এরা এমন বেহিসাবীভাবে খরচ করতে পারে। অফিসে ঢুকলে যেমন এদের বাইরের খেয়াল তাকে না, ছাড়া পেলে তেমনি কেউ আর পিছন ফিরে চায় না।
>
> আমাদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। আমাদের কাজের দিনে ছুটি, ছুটির দিনে কাজ। অফিসে বসে আড্ডা দিতে আমরা যেমন ওস্তাদ ছুটি দিনে ফাইল চষতেও আমরা তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ। আসল কথা, আমাদের জীবনে উপভোগ নেই, কেবলি দুর্ভোগ। আমরা না পাই কাজের আনন্দ, না ছুটির আমেজ। সোমবার আমাদের কাছে আপদ, অতচ রবিবার নয় কোন সম্পদ। আমাদের কী যে বিপদ।

এক ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না। ওরা কর্মঠ এবং উদ্যমশীল, বিরামহীন প্রয়াসের দ্বারা প্রকৃতির দান শতগুণ বর্ধিত করে নিজেদের উন্নতির বুনিয়াদ গড়ে

তোলে। আমরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

> আল্লার সৃষ্টির পর স্বদেশে মানুষ কদাচ হাত লাগায়। আমাদের দিঘিতে যত পদ্ম ফুটুক, ঘাটের শ্যাওলায় পা পিছলানোর ঝক্কি কিন্তু চিরদিনের। ... আমরা তোয়াকুল্লাহ, আল্লাহ ভরসা, ওরা বাহু বিশ্বাসী।

দৃষ্টান্ত অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। বিপরীতার্থক ভাবের দ্বন্দ্বে স্পন্দিত সরস বাক্য রচনায় সানাউল হক সিদ্ধহস্ত। বাংলা গদ্যের অনবদ্য কারিগর প্রমথ চৌধুরী হয়তো সানাউল হকেরও প্রিয় লেখক হবেন। তবে কেবল বিচ্ছিন্ন উক্তির প্রখর দ্যুতির মধ্যেই গ্রন্থের আবেদন সীমাবদ্ধ নয়। সানাউল হক কবিও বটে। গ্রন্থে ছড়া ও কবিতার ছড়াছড়ি। সবই স্বরচিত। টুওয়োম্বো নগর দর্শন সমাপ্ত হলে লেখেন :

> কোথায় আমার দেশ, কোথায় টুওয়োম্বো
> এখানে বাছুর তবু ডাকে কেন হাম্বা।
> এখানে যুবতী মেয়েদের সাথে
> চোখাচোখি ঘটে যদি সিঁড়ির গোড়াতে
> কেন সেই অতিচেনা লজ্জার লাল
> নিমেষে রাঙিয়ে দেয় জোড়া জোড়া গাল
> এখানেও ঘুঘু আর ঘুঘুনীর এক সাথে ঘোরা
> নিজ কীর্তি উচ্চারণে এরা কেউ নয় মুখ চোরা।
> কোথায় আমাদের দেশ কোথায় টুওয়োম্বা
> ফলের দোকান জুড়ে এখানেও জুলে কেন রম্ভা।

বইয়ে কিছু শব্দের বানান আঞ্চলিকতা দোষদুষ্ট। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার সময় সাবধান হলে এগুলো সহজেই এড়ানো সম্ভব হত। গ্রন্থকারের কোনো কোনো চিন্তা একটু উপদেশাত্মক বা সদ্ভাবমূলক। সব সময় তা রচনার রম্যতার অনুকূল হয় নি।

গ্রন্থের প্রচ্ছপট ও শিরোনাম অংকনে উৎকৃষ্ট রুচি ও মৌলিকতার পরিচয় রয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম। ভাল বই সুন্দর পরিপাটিরূপে প্রকাশিত হতে দেখে সবাই আনন্দিত হবেন।

রণেশ দাশগুপ্ত : শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

গ্রন্থে চারটি প্রবন্ধ আছে। সাহিত্য, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ এবং আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত। দ্বিতীয় আলোচনাই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়, আয়তনেও এটি সবচেয়ে বড়। প্রথম প্রবন্ধ তার তত্ত্বমূলক ভূমিকা, শেষের দুটি মূল তত্ত্বের বিশিষ্ট প্রয়োগের ব্যাখ্যা। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে রচিত ও প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলি একত্রে একটি সুসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বালোচনার অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।

পূর্বপাকিস্তানে সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ বেশি প্রকাশিত হয় নি। হলেও তার অধিকাংশই ইতিবৃত্ত জাতীয় বা বর্ণনাভিত্তিক। তাতে বিভিন্ন লেখকের নির্বাচিত রচনাসমূহের শিল্পগত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই লভ্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতিব বৃহত্তর পটভূমিতে শিল্প ও সাহিত্যের মৌল প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত গ্রন্থকারগণ উদ্যোগী হন নি। যে স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাম্প্রতিককালে রসতত্ত্বের আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদেব মধ্যে প্রায় সকলেই অধ্যাপক। যেমন সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশবাফ এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। তাঁদের রচনাও আয়তনে ক্ষীণ এবং মূলত বিধিবদ্ধ গবেষণার রীতি অনুসারী। কেবল আলাউদ্দিন আল আজাদই অনেক স্থলে সমাজ-সচেতন শিল্পানুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের তত্ত্বাশ্রয়ী মূল্য বিচারে প্রবৃত্ত হযেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত অধ্যাপক নন। তিনি সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও সাহিত্য-রসিক। এই কারণে তাঁর রচনার স্বাদও স্বতন্ত্র। তাব ওপর তিনি বিশিষ্ট মতবাদে আস্থাবান। তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সুনির্ধারিত প্রত্যয়েব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁব সাহিত্যচিন্তা তাঁর সমাজচিন্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পকর্মের সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি সমাজতন্ত্রের মূল সূত্রসমূহের সাহায্যেই নিষ্পন্ন করেছেন। এই হিসেবে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। গতানুগতিক সাহিত্যালোচনার পরিমণ্ডলে এই বই এই গুণের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকাবী।

এই কাজ সহজ ছিল না। প্রথমত তত্ত্বালোচনা মাত্রেই দুরূহ কর্ম। সহজ সত্যেরও আন্তরমূল্য উদঘাটনের চেষ্টা দুর্বোধ্যতায় পর্যবসিত হওয়াব আশংকা থাকে। বিশেষ করে সেই প্রসঙ্গের পরিভাষা যদি বহু ব্যবহাবের দ্বারা একটা স্বাভাবিক অর্থবোধকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না থাকে। রণেশ দাশগুপ্তের রচনার এইটেই হল কঠিনতম পরীক্ষা স্থল। তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাঁকে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পারিভাষিক শব্দ ও বাক্যাংশের গুরুভার পরিহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অনেক দীর্ঘ এবং জটিল বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বহু পাঠকেব জন্যই শ্রমসাধ্য বিবেচিত হবে। তবে একবার প্রবেশ করতে পাবলে এর আবেদন তীব্রভাবে অনুভব হবে। কারণ রণেশ দাশগুপ্ত কোনো যান্ত্রিক চিন্তার দাস নন। তাঁব সাহিত্যপ্রীতি যেমন গভীব তাঁব রসাস্বাদনেব প্রবণতাও উদার ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

সমাজদৃষ্টি ও সাহিত্যপিপাসার মধ্যে তিনি সমন্বয় অনুসন্ধান করেছেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন।

> 'সাহিত্যের নাড়ির বন্ধন রয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে। শুধু তাই নয়। নাড়িতে নাড়িতে বাঁধা সে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে, সমগ্র মানব-সমাজের গতি বিস্তারের সঙ্গে। সাহিত্যকে বুঝবার জন্য তাই সমগ্র মানব সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংস্কৃতির জন্য বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত জানার। সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে জানতে হয়, মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতিকে, মানবদেহকে। জানতে হয় মনন বা চেনতার স্বরূপকে। সঙ্গে এদের সবাইকে নিয়ে প্রকৃতিকে।
>
> আলোচনার মাঝখানে এদের মাত্রাধিক্য হলে সাহিত্যবিচার চাপা পড়ে সমাজতত্ত্ব ভারী হয়ে যেতে পারে। অথচ মানবসমাজ, সংস্কৃতি, মনন বা চেতনা এবং মানবদেহ সমেত পরিবেশের ইতিহাসসম্মত ও পরস্পর নির্ভর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে না পারলে আমরা কোনো জিজ্ঞাসার কিনারা করতে পারবো না। আমাদের সাহিত্য চিন্তায় মোটামুটি একটা সর্বাত্মক পটভূমি আনতেই হবে। কারণ ফতোয়া দিয়ে আজকালকার সমৃদ্ধমনা মানুষকে প্রবোধ দেয়া সম্ভব নয়। নতুন সমাজের নতুন মানুষ সমগ্রভাবে জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য এগিয়ে আসছে।'

এই জন্যেই তিনি বিশ্বাস করেন যে সাহিত্যের সামগ্রিক সংজ্ঞার নাম সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শিল্পীর স্বাধীনতাকেও বিচার করেছেন। তার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা পদে পদে খণ্ডিত। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই শিল্পীচিত্তকে স্বাধীনতার অভাবিতপূর্ব নব নব দিগন্তে পৌঁছে দিতে সমর্থ। কারণ কেবল সেই নতুন ব্যবস্থাতেই 'চেতনাতে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্বজন সম অংশীদার।' সমাজতন্ত্রে যখন সকলের যৌথ সত্তা মুক্তধারায় বহু ব্যক্তিকতাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবে শিল্পীর একক বিকাশও তখন হবে যথার্থভাবে স্বাধীন, সম্ভাবনাময় এবং পূর্ণ বলয়িত। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমান সমাজের শিল্পীর আত্মদ্বন্দ্বকে লেখক নানা দিক থেকে বিচার করেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে পরিপুষ্টতা দানের জন্য অস্কার ওয়াইল্ড, উইলিয়ম মরিস, টমাস হার্ডি, রোমা রলা ও রবীন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতিকে একাধিক সংক্ষিপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা পরিস্ফুট করে তুলেছেন। সমগ্র বইয়ের ঐশ্বর্যও এইখানে। লেখক যে কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রধান লেখকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেই নিজের মতো প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন তা নয়, ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসি ও জার্মানি সাহিত্যকদের প্রতিও ঘনঘন দৃষ্টিপাত করেছেন।

আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ প্রবন্ধটি আকারে খুব ছোট হলেও এর মূল প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক চিত্রকলার বিমূর্ত ধারা সম্পর্কে আমাদের সংশয়কে একটা সুনিয়ন্ত্রিত সুসমঞ্জস উপলব্ধিতে পরিণত করতে সাহায্য করে।

যদিও লেখক বিমূর্ত চিত্ররীতির ভক্ত নন এবং বিশ্বাস করেন যে শিল্পকর্ম দুর্বোধ্য হলে এবং *তার আবেদন বৃহত্তর মানব সমাজকে আলোড়িত করতে না পারলে ব্যর্থ সৃষ্টি বলেই* বিবেচিত হবে তথাপি রণেশ দাশগুপ্তের শিল্পোপলব্ধি অনুদার বা সংকীর্ণ নয়। কারণ তিনি

জানেন যে আধুনিক চিত্রকলার প্রখ্যাত শিল্পীরা বিমূর্ত ছবির পাশাপাশি দিয়ে এসেছেন অবিকৃত মূর্তি ও প্রতিরূপকেও। তাঁবা এঁকেছেন অসংখ্য ও অজস্র প্রতিরূপ, যেগুলো উদ্ভট কিংবা কিম্ভূতকিমাকার তো নয়ই, বরং সুষমার সুমিত ও আনন্দঘন ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি। কুশ্রী ও কদাকারের প্রতিচ্ছবিও শিল্পীর দরদী মনের সংস্পর্শে স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকের প্রতিরূপলংঘী অদ্ভুতত্ব সত্ত্বে সমাজের মানুষ প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র রক্ষা করে বলেই ভ্যানগগ ও পিকাসোর সৃষ্টির জগৎজোড়া এত কদর। আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাবের ভোল বদলের কৌতূহলোদ্দীপক কারণ প্রদর্শন করে রণেশ দাশগুপ্ত বলেন, আধুনিক চিত্রকলাকে ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা শুরুতেই নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে দেখে নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের সংশ্লেষিত গণশিল্পরূপের বিরুদ্ধে তাঁরা এই বিমূর্ত চিত্রকলাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্যকে ঢেলে সেজেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সেবা শিল্পী তাঁদের সম্পর্কে গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম। কারণ তিনি মনে কবেন, 'আধুনিক চিত্রকলার নানান, মিশ্রিত উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন ধারার যে পারম্পরিক রীতি-লঙ্ঘন প্রবণতা কাজ করে চলেছে, তার মূল গতিটা হচ্ছে ব্যাপকতম জনগণের অনিরুদ্ধ বিকাশ ও মুক্তিরই গতি।'

আমরা ইচ্ছে করেই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থ থেকে বহুল পরিমাণে উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম। কারণ রণেশ দাশগুপ্তের শিল্পবিচার পদ্ধতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে বারবাব তাঁর রচনা পড়তে হবে। এবং একবার আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা আয়ত্তাধীন করতে পালে নিজের চিন্তায়ও এক নতুন পরিমার্জনা ও প্রগাঢ়তা সম্পাদিত হয়। তখন গ্রন্থাকারেব শিল্পবিষয়ক সকল সমীকরণের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ, বিশ্লেষণশক্তি এবং সততায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ : নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা

পূর্বপাকিস্তানে গুরুগম্ভীর সাহিত্যসমালোচনা অধ্যাপকরাই বেশি করেন। রচনা হিসেবে সেগুলো বেশ ওজনদার হয়। বিতর্কমূলক অজস্র সন-তারিখের উল্লেখ এবং অসংখ্য পাদটীকার নির্দেশে এগুলোর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহর বই এই শ্রেণীর নয়। আকারে বা প্রকারে কোনো অর্থেই নয়। একশ বিশ পৃষ্ঠার পরিমিত আয়তনের মধ্যে, আধুনিক বাংলা কবিতার একজন সচেতন এবং সমজদার পাঠক হিসাবে গ্রন্থকার নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তার কয়েকটি বিশ্বাস এবং ধারণাকে হৃদয়গ্রাহী ওজস্বিতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। গবেষকের অনুসন্ধান বৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সর্ববিধ প্রমাণপঞ্জি আহরণ করবার জন্য ব্যস্ত হন নি, বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সকল স্তর-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করার আবশ্যকতাবোধ করেন নি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লেখক একটা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন এবং সেই অনুসারে সকল যুক্তি সিদ্ধান্ত শৃঙ্খলিত করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহর 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' বিদ্রোহী কবির জীবন কাব্য বা মানসের ওপর কোনো সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ নয়। লেখক সে-রকম দাবিও করেন নি। তিনি ভূমিকায় বলেছেন :

> ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচকের রচনায় নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অস্বীকারের প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রেতর আধুনিক বাংলাকাব্যের নতুন ধারা সৃষ্টিতে নজরুলের ভূমিকা যে পথিকৃৎ এর এ সত্যও তাঁরা অস্বীকার করছেন। উল্লিখিত সাহিত্য সমালোচকদের বক্তব্য যে মূলত ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক বাংলাকাব্যের পটভূমিতে নজরুলকাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং নজরুলের সমসাময়িক ও উত্তরসুরি কবিগোষ্ঠীর ওপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, আধুনিক মুসলিম কবিদের ওপরই নজরুল কাব্যের প্রভাব সমধিক— সে প্রভাব বর্তেছে বিষয়বস্তুগত ও ঐতিহ্যের সূত্রে ... ইত্যাদি।

গোটা বইটাই এই ভ্রান্ত প্রতিপক্ষের এক জোরাল জবাবের ঢঙে লেখা। সে কাজ লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেছেন। মাহ্‌ফুজউল্লাহর বক্তব্য সর্বত্রই স্পষ্ট এবং অনেক স্থলেই কেবল যে জোরাল তাই নয়, ধারালও বটে।

সূচিপত্র নেই বটে তবে বইয়ে তিনটে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে। তাদের আলাদা আলাদা শিরোনামও মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ, পটভূমি। দশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে সমগ্র বাংলাকাব্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা এবং সর্বোপরি নির্যাতিত

মানবতার উদ্বোধন নজরুলের কবিচিত্তে' যে অর্থে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তেমন আর কখনো অন্য কবির ক্ষেত্রে ঘটেনি। দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম : নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা। এইটেই মূল প্রবন্ধ। সত্তর পৃষ্ঠার এই আলোচনায় লেখক বলেছেন যে রাবীন্দ্রিক ললিতগীত কল্লোলের বিরুদ্ধে প্রথম সবল ও সার্থক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নজরুল ইসলাম। যাঁরা নজরুলের পরিবর্তে এই বিদ্রোহের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ সেনের উপর আরোপ করতে চান তাঁদের মতামত কী পরিমাণ ভিত্তিহীন তা ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলাকাব্যে মুসলিম সাধনা। এই অংশে নতুন পুরাতন, পূর্বপাকিস্তানের প্রায় সকল কবি সম্পর্কেই কোনো না কোনো রকম মন্তব্য করা হয়েছে। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ কেবল সমালোচক নন, তিনি কবিও বটে। সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত স্বভাবতই অনেক পাঠক মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আগ্রহ অনুভব করবেন। এই বইয়ের সীমাবদ্ধতা এই জায়গায় যে লেখক নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কবির রচনারীতি ও মানসপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন অত্যধিক পরিমাণে সাধারণীকৃত বা জেনারেলাইজড বৈশিষ্ট্যের ঢালাও বর্ণনার দ্বারা। মূল বক্তব্য সংকীর্ণ হবার জন্য মুখ্য মন্তব্যগুলোর কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মাহ্‌ফুজউল্লাহর বইয়ের আকর্ষণীয় গুণ এর রচনাপ্রণালীর বেগবান ও অনর্গল প্রবহমনাতা। তার ওপর নজরুলের পূর্বপাকিস্তানি ভক্ত পাঠকমাত্রই গ্রন্থে নিজের মনের প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করে আনন্দিত হবেন।

মোহাম্মদ মোর্তজা : প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক

মোহাম্মদ মোর্তজার 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক' বইটির রঙিন প্রচ্ছদপট, খর্ব আকৃতি এবং সরস শিরোনাম একাধিক অর্থে ভ্রান্তি-উৎপাদক। জনপ্রিয় অর্থে বইটি আদৌ রসাল নয়। বইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বহুবিধ তত্ত্বচিন্তায় সমৃদ্ধ এবং সাহিত্যানুপ্রাণিত হৃদয়ের দরদ দিয়ে লিখিত। বইয়ে দুটো প্রবন্ধ আছে। প্রায় সমান আয়তনের। প্রথম প্রবন্ধে লেখক বিবাহের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। দেশ-বিদেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করে সমাজতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ একত্রিত করে এই সত্য প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন যে বিবাহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদটি প্রকাশ্যে প্রচার করা। সংসারধর্ম পালনের, বংশরক্ষা করার, মানবজীবনের ধারা নিরবচ্ছিন্ন রাখার, আত্মসুখ ও প্রতিষ্ঠা অনুসন্ধানের এই সমাজ সংগঠনের সংকল্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করার নামই বিবাহ। বিবাহের প্রকৃতিই এমন যে এ বস্তু গুপ্ত থাকলে সত্য হয় না, কেবলমাত্র ঘোষিত হলেই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বীকৃতি দানকারী শক্তি অবস্থাভেদে সমাজ ও সমাজপতি, ধর্ম ও ধর্মনেতা অথবা রাষ্ট্র ও তার আওতাভুক্ত অফিস। সমাজে নারীর হীনাবস্থা এবং পুরুষের স্বার্থপরতা কী অর্থে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কেব মধ্যে নানা প্রকার আবিলতা সৃষ্টি করেছে লেখক তা নির্মম স্পষ্টভাষিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কেউ নিজেকে সুখী বলে বিবেচনা করলেই সে সুখ ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিতে লেখক রাজি নন। এ ব্যাপারে তাঁর অতি প্রখর ও অকুণ্ঠ অভিমত হলো এই যে :

> এই ধরনের অবস্থায় যাহা আপত্তিকর তাহা তাহারা অসুখী বলিয়া নহে, আপত্তিকর কেননা সেমত অবস্থায় মানুষের জীবনপরিধি ক্ষুদ্রতর হইয়া আসে, অনেক সময় অপমানকর অবস্থায় নামিয়া যায়। বেশ্যাবৃত্তি আপত্তিকর, তাহারা অসুখী বলিয়া নহে, তাহারা মানবীয় বিচারে অপমানিত, তাহাদের জীবনপদ্ধতি জঘন্য বলিয়া। ভিক্ষাবৃত্তি অন্যায়, ভিক্ষুকগণ অসুখী বলিয়া নহে, তাহারা মানবতার কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া। দারিদ্র্যকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা মানবীয়, কারণ দারিদ্র্য মানুষকে পদাঘাত করিয়া ধুলায় মিশাইয়া দেয়, দরিদ্ররা অসুখী বলিয়া নহে। সেইভাবে, বিবাহে মানসিকতার অস্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহারিক সমাজ এবং তৃতীয় পক্ষের অযথা চাপ প্রয়োগের রীতি নিন্দনীয়, ইহার ফলে দম্পতিগণ অসুখী হইয়া পড়ে বলিয়া নহে, নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে জীবনের উপলব্ধি ব্যাপক ও প্রকৃত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় না। ইহার ফলে জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিধি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

এই শাণিত যুক্তিবাদের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষণীয়। লেখকের জীবনানুভূতির সরলতা এবং প্রকাশভঙ্গীর পারিপাট্যের অতি প্রীতিকর পরিচয় পাওয়া যায় বইয়েব দ্বিতীয় ভাগে। পাণ্ডিত্যের চেয়ে কৌতুকমণ্ডিত পর্যবেক্ষণশক্তির তীর্যক প্রয়োগ বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেছে। একটা লঘু অনাসক্তি এবং নৈর্ব্যক্তিকতাব প্রলেপ

লেখকের মনের খেয়ালিপনাকে গোপন রাখতে পারে নি। বিজ্ঞাপনপ্রবুদ্ধ সত্যান্বেষী লেখক আমাদের এ প্রশংসায় খুশী না হতে পারেন, পাঠক হিসাবে আমরা লাভবান হয়েছি। কী কী পরিস্থিতিতে প্রেমের উদগম সচরাচর লক্ষ করা যায় লেখক তার তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেমন,

> রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত বৈকল্যের সময় সেবা বা সাহায্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমভাব জাগিয়া থাকে, কেবলমাত্র প্রচারের জোরে দুইজনের মধ্যে প্রেমভাবের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, অনেক সময় লাগিয়া থাকিলে হৃদয় জয় করা যায়, অনেক তরুণ-তরুণী প্রেমে পড়িতে না পারিলে মনে মনে দুঃখানুভব করিয়া থাকে ইত্যাদি। সাহিত্য জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত আহবণে লেখক বিশেষ পটু। যেমন বলেছেন যে, অনেক পুরুষ আছে যাহারা প্রভুত্বকারিণী স্ত্রীলোক পছন্দ করে। বাঙালি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন এই ধরনের পুরুষ। তাঁহার বিখ্যাত নারীচরিত্রগুলিব অধিকাংশ এই পর্যায়ের।

অন্যত্র উল্লেখ করেছেন—

> সকলের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা প্রেম সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এ গোবিন্দলাল প্রেমিক। সে তাহার স্ত্রী ভ্রমবকে ভালবাসিয়া ছিল। সে রোহিনীকেও ভালবাসিয়াছিল। উভয়ই তাহার পক্ষে সম্ভব এবং তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতিশীল। কিন্তু হরলাল সম্পূর্ণ বিপরীত পুরুষ। সে কার্যোদ্ধারের জন্য রোহিনীকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে যে কেবল রোহিনীকেই ভালবাসে নাই বা বাসিতে পারে নাই তাহা নহে, সে কাহাকেও ভালবাসিতে অসমর্থ। তাহার মানসিক গঠন ও প্রকৃতি তাহার অনুকূল নহে। সেইজন্য যাহা গোবিন্দলালের পক্ষে বারবার করা চলে হরলালের পক্ষে তাহা একবারও করা চলে না।

এই সকল উদ্ধৃতি, দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণের দ্বারা যে উপলব্ধি লেখক আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে প্রয়াস পেয়েছেন সে হলো এই যে, নরনারীর প্রেমভাব জাগ্রত হওয়া না হওয়া অনেক পারিপার্শিক অবস্থাবলী ও তাহাদের মানসিক গঠনের একটা বিশেষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এই প্রকৃতি সেই বিশিষ্ট ক্ষণের জন্য ধরিতে হইবে। ঠিক এইজন্য প্রেম ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য। অবশ্য এটাই লেখকের শেষকথা নয়। পরিবর্তনশীল প্রেমাবস্থার পরমরমণীয় পরিণতির সম্ভাবনার সুসংবাদও তিনি পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় :

> জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধতা অথবা ঘটনা পরিক্রমার সংঘাতে নরনারীর যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে তাহা প্রেম অপেক্ষা আরও নিবিড় ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। উহাই আমাদের কাম্য। হইতে পারে যে এই পরিপক্ব নিবিড়তার সূত্রপাত হইয়াছিল প্রেমের মধ্য দিয়া কিন্তু ইহা প্রেম নহে। প্রেম এই সাধনালব্ধ ঘনিষ্ঠতার গভীরতা পরিমাপ করিতে পারে না।

মোহাম্মদ মোর্তজা : জনসংখ্যা ও সম্পদ

মোহাম্মদ মোর্তজার 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত। লেখকের এই ধরনের আরেকটি বই নিয়ে কিছুকাল আগে আমরা আলোচনা করেছি। তার নাম 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক'। তথ্যবহুল তত্ত্বচিন্তাপূর্ণ পাণ্ডিত্যমণ্ডিত গ্রন্থ রচনায় মোহাম্মদ মোর্তজা সিদ্ধহস্ত। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও চেতনা যেমন তেজোময় তেমনি ক্ষুরধার, যেমন, সূদুরপ্রসারী, তেমনি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। তাঁর বইয়ের নাম যাই থাক না কেন, আসলে তাঁর সকল রচনারই মুখ্য বিষয় সমকালের স্বীয় সমাজ, তাঁর জরা-ব্যাধি-বিকার। মোর্তজার বই যে এত প্রকার সংখ্যানকসা পাদটীকায় কণ্টকিত হয়েও চিত্তাকর্ষক হয় তার কারণও এই অবলীলাক্রমে তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেন, সমাজজীবনেব যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে নিজের প্রিয় সিদ্ধান্তসমূহ প্রবল ওজস্বিতা এবং মনোহর বক্রতার সঙ্গে ব্যক্ত কবতে থাকেন, এবং অনেকক্ষণ বিষয়বস্তুর অতিবিস্তারের মধ্যে অবাধে বিচরণ করার পবও এত স্বচ্ছেন্দে মূল প্রসঙ্গের আওতার মধ্যে ফিরে আসতে জানেন যে তখন প্রসঙ্গচ্যুতিব অপবাদ তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। লেখাও বড় সরস। মোহাম্মদ মোর্তজার খোলসটাই কেবল বৈজ্ঞানিকের, আপাতদৃষ্টিতে যা অপক্ষপাতমূলক আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় অটুট। মোর্তজার রচনারীতি যে অন্তরকে প্রকাশ করে তার স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। লেখক মোর্তজা কল্পনাপ্রবণ, রাগে-রোষে উদ্দীপ্ত, সংস্কারে-বিশ্বাসে সমভাবে আন্দোলিত। তাই মোর্তজার 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বই নয়। সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, একনায়কত্ব, শিল্পায়ন, নারীস্বাধীনতা, ধর্ম, মোক্ষকাম সর্বপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থকার পরিবার পরিকল্পনার সারবত্তা বিচার করেছেন। সেজন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রচুর। একাধিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত এই পাণ্ডিত্যের তারিফ করবেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমাদের পাওনাটা উপরতি, সেটা এর সর্বাঙ্গীণ সরসতা। লেখকের মূল বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট। 'পরিবার পরিকল্পনার কোনো পৃথক সত্তা নেই। এটা সামগ্রিক জীবনদর্শন ও পদ্ধতির সঙ্গে একাঙ্গীভাবে জড়ীভূত। সেইজন্যই এই পরিকল্পনা নিয়ে এককভাবে এগোতে গেলে ফললাভ অসম্ভব।' তাঁর মতে পরিবার পরিকল্পনার সমস্যা একটা সামাজিক সমস্যা, যান্ত্রিক সমস্যা নয়। অনেকের ধারণা জন্মনিরোধে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সস্তায় ও সহজে সাপ্লাই করতে পারলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। পরিবার পরিকল্পনার স্তরে পৌঁছুতে হলে সমগ্র সমাজ তথা গোষ্ঠীকে একযোগে পরিবর্তিত হতে হবে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে, দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে, একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও জোর প্রচারণা চালাতে হবে। একযোগে সকল দিকে অগ্রসরলাভের আয়োজন না করে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে দিলেই আপনা থেকে দেশের উন্নতি সাধিত হবে না। এ যুগে মানুষের আত্মশ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বিশ্বাস টলে গিয়েছে। সজ্ঞানে সচেতন হয়ে সচেষ্ট না হলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। লেখকের ভাষায়, মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য

হয়েছে যে, তার জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার দম্ভ অযৌক্তিক। কপার্নিকাস, ফ্রয়েড, ডারউইন, ম্যালথাস এবং আরো অনেক মনীষী বারেবারে আমাদের গতানুতিক বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিযে আমাদেব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে বিশ্বে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান জন্মগত অধিকারেব বলে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটা তাকে সুপরিকল্পিত কঠোর পরিশ্রমেব দ্বারা অর্জন করতে হয। মানুষকে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে জীবনেব সর্বক্ষেত্রে একই সঙ্গে এবং একই কঠোবতায়। 'সংখ্যাবৃদ্ধির অনিয়ন্ত্রিত হার কখনো কখনো এই উৎকর্ষ অর্জনেব একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে একটা সীমা ও সময়সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এটা সৃষ্টির মূলনীতিব সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।'

মোহাম্মদ মোর্তজা : চরিত্রহানির অধিকার

গ্রন্থশেষে ঔপন্যাসিক গল্পের পটভূমি সম্পর্কে এক দীর্ঘ সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ সংযোজিত করেছেন। সেই অজুহাতে আমিও গ্রন্থালোলোচনার পূর্বসূত্র স্বরূপ গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে উন্মোচিত করতে চাই। মোহাম্মদ মোর্তজার পেশা ডাক্তারি। রোগেব কারণ নিরূপণ এবং তার নিরাময়ের নির্দেশদানের মধ্য দিয়ে তিনি বিচিত্র নরনারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছেন, ব্যক্তি ও সমাজকে এক বিশিষ্ট দৃষ্টিতে পরীক্ষা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া মোহাম্মদ মোর্তজা সমাজতত্ত্ববিদও বটে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধির প্রয়াসে তিনি ক্লান্তিহীন। তাঁর সমাজতত্ত্ববিষয়ক বচনা তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তি-নির্ভব এবং সিদ্ধান্ত-পরিপুষ্ট। মোহাম্মদ মোর্তজা একই সঙ্গে চিকিৎসক ও সমাজতত্ত্ববিদ। উপন্যাস-রচনার শিল্পকর্মে উদ্যোগী হয়েও তিনি তাঁব মানসিকতাব এই দুই মৌল প্রবণতাকে পরিত্যাগ করেন নি। কাহিনীর বিষয় নির্বাচনে, গ্রন্থনবীতিতে এবং পরিণাম নির্দেশে তাঁর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

চবিত্রহানির অধিকাবের নায়ক মালেক। জমিদার-বংশে জন্মলাভ করেছিল বটে তবে পবিবাবগত ঐশ্বর্যেব কণামাত্র তার ভাগ্যে জোটেনি। অভিশপ্ত পিতৃগৃহে সে জন্মকাল থেকেই উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। বাল্য বয়সে পিতার মৃত্যুর পর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন যখন আরও বৃদ্ধি পায় তখন সে গৃহত্যাগ করে। পিতৃবন্ধু বিত্তবান ডাক্তার রফিক তাকে আশ্রয়দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু অভিজাত বংশীয়া পত্নীর বিরূপতা আশংকা করে অনাথের হিত সাধনে বেশি আগ্রহ প্রকাশ না করাই নিরাপদ বিবেচনা করেন। তবুও খোরাকির বিনিময়ে কিশোর মালেক ড. রফিকের বালিকা কন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়। ইংরেজি স্কুলে পড়া মেয়ে মালেককে সমীহ করে বলার কোনো কারণ দেখে না। কন্যার মাতা এই এতিম বালককে গৃহভৃত্যের অধিক মর্যাদা দানের আবশ্যকতা বোধ করে না। মালেকের মনে স্পষ্ট গেঁথে গিয়েছিল, প্রথম দিন তার নাস্তা দেয়া হয়েছিল একটা বাসনে করে মুড়ি, এক পাশে একটু গুড় আর একগ্লাস জল।... কিছুদিন পর মুড়ির পরিবর্তে এল চালভাজা... আরও কিছুদিন খাওয়ার পর একদিন সে দেখল তার নাস্তার বাসনে কিছু চাল ও একটুখানি গুড়।... খাওয়ার সময় তাকে যে পরিমাণ ভাত দেওয়া হতো তাতে কখনো একজন লোকের খাওয়া চলতে পারে না। যে তরকারি দেওয়া হতো তাতে সেই অল্প পরিমাণ ভাতও খাওয়া চলে না। কখনো তরকারি একেবারেই থাকত না শেষে অন্নজলের এই ব্যবস্থাটিও লোপ পেল। একদিন সকালে পড়াতে এসে মালেক দেখল ড. রফিকদের বাড়িতে তালা ঝুলছে। ড. রফিক বদলি হয়ে অন্য জেলায় চলে গেছেন এবং যাবার আগের দিন পর্যন্ত মালেককে সে সম্পর্কে কোনোরকম সংবাদ দেন নি। মালেকের কিশোরজীবনের এই পটভূমি উপন্যাসের প্রথম বিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিবেশ মালেকের চরিত্র গঠনে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ইঙ্গিত দান করে লেখক বলেছেন—

'সে স্পষ্ট দেখতে পেল এই পৃথিবীতে তাকে টিকে থাকতে হলে তার এতদিনের

অপরিচিত বৃহত্তম পৃথিবীর সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে তাকে মিশে যেতে হবে। আর মিশে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য তিলে তিলে গড়ে তুলতে হবে। ঘটনাচক্রের সে নির্মূল সেকথা সত্য কিন্তু টিকে থাকবার দুর্দমনীয় কামনার হাতছানি যাতে তাকে মরীচীকার মতো ঘুরিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে না পারে তার জন্য তাকে যথাসম্ভব মাথা উঁচু কবে রাখবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টায় কোনো রকম অসাবধানতা ও শৈথিল্য যেন তার পক্ষ থেকে প্রশ্রয় না পায় সেদিকে তাকে নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। আঘাত মালেককে নষ্ট করতে পারে নি, বরঞ্চ তাব চরিত্রকে শক্ত এবং সবল করে তুলতে সাহায্য করেছে।'

এরপরই মালেকর সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হল তখন সে পূর্ণ পবিণত যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জনপ্রিয় কৃতী ছাত্র। যেমন সুন্দর বক্তৃতা দেয় তেমনি সুলেখক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান অর্জন করেছে। অন্যান্য অনেক মেয়ের মতোই প্রথম বর্ষের ছাত্রী ড. রফিকের কন্যা রোকেয়া ইসলামও মালেকের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বোকেয়ার রূপে প্রীত হওয়া মালেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সে ছিল চলনে বলনে উগ্র আধুনিকা। সাজগোজের প্রণালী লজ্জাহীন এবং যখন বাংলা বলতে চেষ্টা করত তখন উচ্চারণ হত বাঁকা বাঁকা, ভাষা হয়ে উঠত দোআঁশলা। কিছু নমুনা উদ্ধৃত কবছি :

yesterday Daddy আব Muaray আপনার কোতা Discuss কোবছিল। আমি before that আপনার কোতা ছনেচি। এ্যাপনি যদি আমাদেব residence এ আসেন তো Daddy and Muaray very খুছি হবেন। Surely.

মালেকের উপেক্ষা রোকেয়া গায়ে মাখল না। ভাল করে বাংলা বলতে শিখল, প্রসাধনেব আতিশয্য বর্জন করল, নিজেকে মালেকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল কিন্তু মালেকের মন পেল না। মালেকের মতে এটা ভালবাসা নয়, মোহ বা বৈক্লব্য মাত্র। রোকেয়া বিশ্বাস করে 'তোমাকে ভালবাসি সে আমার মোহ নয়'। এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেই রোকেয়া অপেক্ষা করল যতদিন না মালেক বিদেশ থেকে ফিরে আসে। এতদিন পরও মালেকের মত পরিবর্তিত হল না। রোকেয়ার প্রেমানুভূতির আন্তবিকতাকে অস্বীকার করবার মতো মানসিক অবস্থা মালেকেরও আর নেই; তবু সে রোকেয়াকে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করল। এতদিন পরে সে রোকেয়াকে জানতে দিল যে তারা দুজন সমাজের দুই বিপরীত কোটির প্রতিনিধি। যাদের দ্বারা মালেকের জীবন বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত রোকেয়া তাদেরই একজন। রোকেয়াদের বাড়িতেই মালেকের বাল্যজীবন কী দুঃসহ অপমান ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে সে কথাও মালেক গোপন করল না। বাড়ি ফিরে রোকেয়া তার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে মালেকের সকল অভিযোগ সত্য। যে পিতামাতাকে সে অন্তর থেকে ভালবাসত, হয়তো শ্রদ্ধাও করত, তাদের সান্নিধ্য এর পর থেকে তার কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। সান্ত্বনা লাভের জন্য ছুটে গেল মালেকের কাছে, কিন্তু মালেক এবারও তাকে প্রত্যাখ্যান করল। আত্মরক্ষা করার মতো আর কোনো অবলম্বনই রোকেয়ার থাকল না। উপন্যাসের মধ্যস্থলের এই হলো তুঙ্গতম মুহূর্ত। প্রেমের স্পর্শে তার যে নবজীবন লাভ ঘটে তার ফলে পূর্বতন পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাবর্তন করা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না, অপরদিকে ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে জয় করার মতো চিত্তবল সে সম্পূর্ণ খুইয়ে বসেছে। সে অপ্রকৃতিস্থ হল হল,

নিজেকে নষ্ট করবার নেশায় মত্ত হল। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রন্থকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রোকেয়ার অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য অধঃপতনের প্রতিটি স্তর বিবৃত করেছেন। নির্বিচাবে বহু পুরুষকে দেহদানের পরিণাম স্বরূপ রোকেয়া সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হল এবং মালেককে সে কথা জানিয়ে দিয়ে কাহিনী থেকে বিদায় নিল। সংক্ষেপে এই হল চরিত্রহানির অধিকার। মালেক নয়, রোকেয়াই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। লেখক তার রূপ ও বৈদগ্ধ্য, তাব চরিত্রগত উচ্ছলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, তার প্রাণশক্তি ও বিকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য ও অন্তরদৃষ্টির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রোকেয়া যে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার নীতিজ্ঞানহীন ভোগলালসাপূর্ণ জীবনকেও নির্মম সততার সঙ্গে উদঘাটিত করেছেন। রোকেয়ার তুলনায মালেকের চরিত্র অনেক নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ এবং কর্মশক্তিহীন। মালেকের আদর্শবাদের মূল্য শেষপর্যন্ত ঋণাত্মক এবং সে বহুলাংশে শূন্যতারই প্রতিমূর্তি। এবং এই কারণেই হয়তো কাহিনী যে উৎকণ্ঠা আমাদের মনে সৃষ্টি করে তার পূর্ণাবযব পবিতৃপ্তি ঘটাতে সমর্থন হয় না। গ্রন্থশেষে সংযোজিত প্রবন্ধে লেখক মালেকের জীবনাচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও বলেছেন, গল্পে লক্ষ করা গিয়েছে মালেক চৌধুবী মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র অস্বীকৃতি-ত পর্যবসিত। সে অস্পষ্টভাবে জানে কোথায় তাকে না কবতে হবে, ভাসা-ভাসা-উপলব্ধি করে কোথায় পদসঞ্চারণ তার নিষিদ্ধ অন্তরের গভীরে অনুভব কবে অভিসারের কোনো বৈঠকখানায় সে যেতে পারে না; কিন্তু সে জানে না এই না করার পরিণতিতে কোন হ্যাঁ-কে তাব জীবনে মূর্ত করে তুলতে হবে। সে জানে না কোথায তার কর্মপ্রচেষ্টাকে উড্ডীয়মান পাখিব মতো সাবলীল স্বচ্ছন্দ, সুষম ও স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। সে জানে না তাব অভিসাবের বাঁশি তাকে আহ্বান করে কোনো গাছতলায়, কোনো মাঠের প্রান্তে, কোনো নদীর কিনারে। তাই মালেক চৌধুরী কী নয় সেটা আমরা যতটা বুঝি, সে যে আসলে কী তা আমরা ধরতে গেলে মোটেই বুঝিনে।

কিন্তু এসব হল সমাজতত্ত্ববিদ প্রবন্ধকারের কথা। প্রবন্ধটি মূল্যবান তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু যত ব্যাখ্যা তত্ত্বাকারে সেখানে উপস্থিত হয়েছে আমরা সন্দেহ করি তার সকল সত্য কাহিনীর মধ্যে যথার্থ শিল্পরূপে পরিগ্রহ করে নি। অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে কিন্তু জীবন-ভাষ্যরূপে উপন্যাসে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। যে জটিল ও বহুমাত্রিক উপলব্ধি কাহিনীর পরিকল্পনার লক্ষণীয় কার্যত তার রূপায়ণ অত মর্মস্পর্শী ও প্রত্যক্ষ নয়। একদিকে মালেক অন্যদিকে রোকেয়া উভয়ের জীবনই দুটো স্বতন্ত্র ও সরল খাতে পরিচিত ও প্রত্যাশিত পথ ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। তবুও আমরা স্বীকার করি যে 'চরিত্রহানিব অধিকার' আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনার ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থকারের জীবনবোধ সমাজসচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তির দ্বারা উজ্জীবিত। ব্যক্তিজীবনের দৈন্য ও ঐশ্বর্যকে সমষ্টিগত সামাজিক অস্তিত্বের দর্পণ রূপে উপলব্ধি করার এই প্রয়াস মোহাম্মদ মোর্তজার শিল্পপ্রবণতার বৈশিষ্ট্যকেই মর্যাদাবান করে তোলে। এই প্রবণতা কলামণ্ডিত হলে রচনা যে আমাদের রস-পিপাসাকে আরও অধিক মাত্রায় পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নুরুল ইসলাম খান : মেহের জুলেখা

মেহের জুলেখা উপন্যাসে লেখক একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছেন। তাতে বলেছেন, মেহের জুলেখা আঙ্গিকের দিক থেকে এক বিচিত্র পরীক্ষা। এ উপন্যাসে আটটি ছোটগল্প আছে আর এগুলো মিলিয়েই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি। বিচিত্রতর এদের পটভূমিকা, রোমান্টিক এবং সংঘাতময় মনে হলো কাহিনীটি। উপন্যাস হিসেবেই কাহিনীট জমকালো ঠেকবে— কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পে ছোটগল্পের শুরু, পরিবর্ধন ও ক্লাইমেক্স রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলাসাহিত্যে এ ধরনের টেকনিক নতুন বলেই আমার ধারণা। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য বলতে পারবেন পাঠক ও সমালোচক। নিজের রচনার টেকনিক নিজে ব্যাখ্যা করার কোনো দোষ নেই, তবে সে টেকনিকের অভিনবত্বের মূল্য সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অবশ্যই একটু এদিক-ওদিক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে লেখক নিজে মিতবাক এবং সুবিনয়ী হলে পাঠকের সহানুভূতি লাভ সহজতর হয়। ভূমিকার দাবি একাধিক কারণে দুর্বল। এক, টেকনিক এমন কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নয় যা রচনা থেকে আলাদা করে বিচার করা সম্ভবপর। দুই, যদি তা সম্ভবও হয়, বর্তমান রচনায়, লেখক নিরূপিত বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষণীয় নয়।

মেহের জুলেখা উপন্যাস কতগুলো ঘটনার সমষ্টি হলেও, কতগুলো স্বতন্ত্র বসপুষ্ট ছোটগল্পের সমাহার নয়। কাহিনীর একটা পূর্বাপর ধাবা এব মধ্যে প্রবহমান: যে-কোনো পর্বের একটি ঘটনা অবশ্যই তাব পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনার আভাস পরিণামেব পবিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। জুলেখার সঙ্গে জহুরের, মেহেরের, এনায়েতের, মেহেরাবের, ইসাব, দিলারের সম্পর্ক বিভিন্ন পরিচ্ছেদে খণ্ডে খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে বলেই তারা ছোট ছোট গল্পে পবিণত হয়নি। জুলেখার চরিত্রই উপন্যাসের আধার। তাকে কেন্দ্র করে যে সকল ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে জুলেখার স্বভাবের প্রবণতা ও তার জীবনের পরিণামকে একটা সামগ্রিকতা দান করতে সাহায্য করেছে।

সাহিত্যের অধ্যাপিকা জুলেখা পরিপূর্ণ যৌবন এবং অসামান্য রূপের অধিকারী। বুদ্ধি পরিণত, হৃদয় অস্থির। এই বাসনা কামনার প্রদীপ্ত শিখায় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার জহুর। জুলেখা তাকে অন্তরঙ্গ হতে বাধা দেয় না, কিন্তু জহুরের প্রত্যাশা যখন বন্ধুত্বের অতিরিক্ত আরো কিছু দাবি করে তখন জুলেখা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। তারপর জুলেখা আকৃষ্ট হয় ইঞ্জিনিয়ার মেহেরের প্রতি, মেহের অবাঙালি। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য প্রতিভায় অসামান্য। তার সঙ্গে চূড়ান্ত অন্তরঙ্গতার ফলে জুলেখা অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং আশংকা করে যে মেহের হয়তো বিয়ে না করেই তাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারে। জুলেখার কাছে এ চিন্তা দুঃসহ মনে হয় এবং অবশেষে মেহেরের ঢাকা ত্যাগের পূর্বরাতে জুলেখার কারণেই তার মৃত্যু ঘটে। তারপর শিশু ইসার মা জুলেখার নতুন প্রেমিক রূপে আবির্ভূত হয় নতুন ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত। দুজনে বিদেশ ঘুরে এসে সুখের সংসার আরম্ভ করে লাহোরে। কিন্তু এনায়েতের কর্মনিমগ্নতা তাকেও জুলেখার প্রতি সাময়িকভাবে

উদাসীন করে তোলে এবং সেই অবসরে জুলেখার হৃদয়ে নতুন প্রেমে প্রবেশাধিকার চায় পতি-বন্ধু মেহেরাব। এনায়েতের পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মেহেরাব বিদায় নেয়; জুলেখা-এনায়েত নতুন করে নীড় বাঁধে ঢাকায়। এই সময়ে উদিত হল দিলার খাঁ, নিহত মেহেরের ছোটভাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মেহের ছোটভাইয়ের কাছে যে পত্র লেখে তা পড়ে এতদিনের জুলেখা জানতে পারল যে মেহের জুলেখাকে অবশ্যই বিয়ে করত; দূবে চলে যাবার আয়োজন ছিল নিছক ছলনা, জুলেখাকে পরীক্ষা করে দেখার এক অহেতুক প্রকাশ মাত্র। আবার জুলেখার প্রাণে মেহেরই প্রধান হল। তবে জাগরণে নয় সুপ্তিতে। জীবনে নয় মরণে। একদিন অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবন করে জুলেখা মেহেরের প্রতীক্ষায় চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রন্থের রচনাকৌশলে অদৃষ্টপূর্ব মৌলিকতা সম্পর্কে লেখকের নিজের দাবির মূল্য যাই হোক না কেন, রচনাটি মূল্যহীন নয়। তার প্রথম উপন্যাস রাজধানীর ইতিকথার তুলনায় এটি অনেক পরিণত ও প্রীতিকর রচনা। বর্ণনা অনেক বেশী প্রাণবন্ত, অনেক স্থলেই প্রকাশভঙ্গী সূক্ষ্ম ও সুন্দর। জুলেখার অসামান্য রূপ, তার অনুভূতি ও উপলব্ধির বহুবর্ণময় ঐশ্বর্য, তাব অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা ও মর্মান্তিক পরিণাম লেখক প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হুমায়ুন কাদির : নির্জন মেঘ

নির্জন মেঘের রজনী নিবাস লেন একটি অন্ধকার গলি। কাঠির মতো লিকলিকে কিন্তু স্বামীব অর্থের জৌলুষে ঝকমকে রোকেয়া বেগমের গাড়ি এ গলিতে ঢোকে না। এই গলিতে থাকে এক দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। বড় মেয়ের নাম ফরিদা বানু। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ডাগর ডাগর চোখ। যদি কালো ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজটা পরে কিংবা মাইসোর সিল্কের শাড়িটা, চুল শ্যাম্পু করে চুলের ফাঁসে খোঁপা বাঁধে, ঠোঁটে লাল রঙ মাখে কি-না-মাখে, তাহলে এখনও ফরিদা বানু মামাত বোন রোকেয়া বেগমের ভাষায়, রূপের আলোকে পৃথিবী জয় করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। তার বদলে চোখে পুরু চশমা পরে, স্যান্ডেল পায়ে, রোজ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ করে। প্রাইভেট বিএ পাস করে চাকরি নিয়েছে মোহামেডান গার্লস স্কুলে। বাবা কোনো সামান্য চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন অনেক দিন। এখন সংসাব সম্পর্কে উদাসীন এবং সামর্থ্যহীন। মা-ও দুর্বল এবং অক্ষম। ছোটবোন কচি কৈশোব অতিক্রম করেছে, পড়াশুনো হল না বলে ঘরের সব কাজ ওকেই করতে হয়। ছোটভাই মন্টু ক্লাস টেনে পড়ে, সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘোরে। যে দলের রাজনীতি কবে, বাত জেগে তাদের জন্য পোস্টার আঁকে।

প্রতিবেশী ইলু খুকির অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বাচ্চা কোলে করে ফরিদাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং সংসারের সুখকর ঝামেলা সম্পর্কে নানারকম মুন্সিয়ানাপূর্ণ মন্তব্য করে। একদিন কচিরও বিয়ে হয়। অবশ্য ক্রমে প্রকাশ পায় যে বড়লোক হলেও চরিত্রবান নয়। হয়তো এমন দুরারোগ্য রোগে ভোগে যার সংক্রামকতা থেকে কচিও মুক্ত থাকতে পারে না।

ফরিদারও একজন প্রেমিক ছিল। নাম আনোয়ার। উস্কখুস্ক চুল, পোশাক আধ ময়লা। পায়ের স্যান্ডেলের গোড়া খয়ে গেছে। প্রায়ই দাড়ি কামাতে খেয়াল থাকে না। দরিদ্র পরিবারের ছেলে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। এই আকর্ষণীয় স্যুডো ইনটেলেকচুয়াল ছিল ফরিদা বানুর প্রেমিক ও প্রণয়ের পাত্র। আনোয়ার কিন্তু শুধু প্রেমের অমৃত সুধা পান করেই জীবন কাটাতে রাজি নয়। সে প্রেমের সকল পরিণামকে বিত্ত ও প্রতিপত্তির সঙ্গে যুক্ত করে পরিতৃপ্ত হতে চায়। ফরিদা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে উচ্চাদর্শের কোনো চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু আনোয়ার তার লক্ষ্য পরিত্যাগ করে না। সিএসপি হয় এবং হয়েই এক কাব্যময় নাটকীয় পত্র প্রেরণ করে ফরিদার সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করে ফেলে।

মন্টু পরীক্ষায় ফেল করে। কচি জীবনে অসুখী হয়। বাবা ও মা মারা যান। ফরিদা বানু বিটি পাস করে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বনে নিজের চেতনা থেকে প্রেমানুভূতির শেষচিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলে। ঘটনাচক্রে ঐ এলাকার এসডিও হয়ে আসে আর কেউ নয় আনোয়ার, যে এখন দিনে অফিস এবং রাতে ক্লাবেই সময় কাটায় বেশি। অন্তরের দুঃখ লাভ করার জন্য এসডিও

সাহেবের পত্নী নিজেই এসব কথা ফরিদাকে বলেছেন। তবু ফরিদা অতীত স্মৃতির তাড়ানায় অস্থির হয়ে গভীর রাতে ছুটে যায় এসডিও সাহেবের বাংলোতে; অন্ধকারে আত্মগোপন করে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এসডিও সাহেবের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ ফরিদা বানু স্বচক্ষে দেখতে চায়।

এই হল নির্জন মেঘ। একটি শ্রান্ত ক্লান্ত দুঃখময় দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। এ জীবন অর্থহীন আলোহীন প্রেমহীন। হুমায়ুন কাদির দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। লেখার ধরনটি সুন্দর। সর্বত্র একটা সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ লক্ষণীয়। চরিত্রগুলো প্রাণময়, উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র।

আবদুর রহমান : খোলা মন

আবদুর রহমানের 'খোলা মন' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বই। মজলিসি মেজাজ, বিদগ্ধ মানস এবং পরিণত রচনারীতি একত্রে মিলিত হয়ে প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে একটা বিশিষ্ট শিল্পমূল্য দান করেছে। প্রতিদিনের পবিচিত নানা বিষযেব স্পর্শ লেখককে নানারকম লঘুগুরুভাবে উদ্বুদ্ধ করে, তার এক-একটা ইশারাকে আশ্রয় কবে লেখক আপন মনেব ভাবনাকে দশদিকে ছড়িয়ে দেন। কোনোবকম কঠিন যুক্তিব শৃঙ্খলা নয়, বিশেষ মুহূর্তের ভাবের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলই বিচিত্র কথার মালাকে সূত্রাকারে গেঁথে তোলে, ব্যক্তিত্বেব নিজস্ব সৌবভে তাকে সরস কবে তোলে। 'খোলা মনের' এটাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয দিক। চিন্তা কবে বড় কথা গুছিয়ে বলতে কোনো জায়গায় লেখক চেষ্টা কবেন নি। কিন্তু আবদুব রহমানের স্বভাবের ঐশ্বর্যই এমন যে তাব অনায়াস প্রকাশও মধুব ও প্রীতিকর বলে মনে হয়। সামান্য প্রসঙ্গ থেকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গভীর সত্য উৎক্ষিপ্ত হযেছে। ববঞ্চ বলা চলে রচয়িতা যেখানে বড় কথা বলাব জন্য বেশি কবে চেষ্টা কবেছেন সেখানেই কৃত্রিম বাণী প্রচাবেব লোভের শিকাবে পবিণত হয়েছেন, উচ্চচিন্তা প্রকাশেব মোহে আবিষ্ট হযে অন্তবঙ্গ আত্মপ্রকাশের পবিবশ মাটি কবে দিযেছেন। এই বইযেব দুর্বলতাও এইখানে। একাধিক প্রবন্ধে চিন্তাপূর্ণ সবস সিদ্ধান্ত এত বেশি ভিড় করে সমবেত হযেছে তাব ব্যূহ ভেদ কবে অন্তরালের মনেব মানুষটিকে সবসময় প্রাণের কাছাকাছি অনুভব করা যায না। সবটা কেমন বেশি জটিল ও ঘোবালি মনে হতে থাকে। তবে উৎকৃষ্ট পবিচ্ছেদেব সংখ্যাও কম নয। যেমন আয়নায় আছে, 'প্রতিটি মাটিব দেহ এক একটি পৃথক জগৎ অতল রহস্য এবং অফুবন্ত আলোর নদী। এইখানে কাঁচেব আয়নাব সঙ্গে আমাব মনমুকুবে তফাত।' কিংবা চরিত্র প্রবন্ধে যখন লঘু কথাব ঢেউ ঠেলে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যতত্ত্বে প্রবেশ কবে বলেন, 'সংসারের মানুষ আর সাহিত্যব চবিত্র ঠিক এক নয। দুটোব প্রকাশ আলাদা। সমাজে ব্যক্তির বিচার হয় কাজের ভালোমন্দে। সাহিত্যে চবিত্রের বিচাব প্রকাশেব সঙ্গতিতে। প্রকৃত জীবনে দু'দশটা বেখাপ্পা ব্যবহাব চলে যেতে পাবে। কিন্তু একটি মাত্র অসঙ্গতি হলেও চরিত্র টেকে না। স্ত্রীকে সন্দেহ কবে ওথেলো শ্বাসবোধ কবে মাবতে পাবে, কিন্তু কখনই ফ্রেইলটি দাই নেইম ইয ওযোমান' বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে পাবে না। সেটা ওথেলো চরিত্রেব ধর্ম নয়।'

হামেদ আহমদ : প্রবাহ

হামেদ আহমদের উপন্যাস 'প্রবাহে'র প্রকাশক পূর্বপাকিস্তান লেখক সংঘ। উপন্যাসটি আয়তনে ছোট, বেশি ছোট, মাত্র নব্বই পৃষ্ঠা। তবে আয়তনে ছোট হলেও যে জীবনপট এতে উন্মোচিত হয়েছে তাতে উপন্যাসে প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। একটা প্রাচীন ও বনেদি পরিবারের সঙ্গে একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও শিক্ষিত পরিবার সাধারণ সামাজিক প্রবোহের টানে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়ে। বৃহৎ একান্ত পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব অভিজাত মদ্যপ তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর মার্জিত রুচি ও পরিশীলিত চেতনাসম্পন্ন সুন্দরী কন্যা খালেদার। এখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। কী করে বৈষম্য বিরোধে পরিণত হয়, বিরোধ মর্মান্তিক আত্মাহুতি ডেকে আনে, একটা অর্থহীন করুণ নিষ্ফল ব্যর্থতা সমগ্র জীবন গ্রাস করে ফেলে গ্রন্থকার দরদ দিয়ে তারই এক শোকচিত্র রচনা করেছেন। কাহিনী নির্বাচন বা উদ্ভাবনের মধ্যে বড় রকমের-কোনো মৌলিকতা নেই। সম্ভবত গ্রন্থকারও তেমন দাবি করেন না। তবে কাহিনীর নির্মাণে এবং প্রকাশে লেখক যে পরিমিতি বোধ, যে পরিচ্ছন্নতা ও মৃদুভাষিতার পরিচয় দিয়েছেন, তাব অকুণ্ঠ তারিফ করি। উচ্চকণ্ঠে সমস্যা প্রচার বা উল্লাসের সঙ্গে দেহসম্পর্ক-বিবাহের একটা পারিবাবিক আলোড়নকে কেন্দ্র করে লেখক যে গল্প রচনা করেছেন তা প্রকারান্তবে আধুনিক মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের এক মূলগত সংকট ও বিরোধকে জীবন্ত প্রতিমূর্তি দান করেছে।

ঘটনা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেখানে খালেদা নেই। তার কিশোরী কন্যা জাহানাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকাবি কর্মচারী মাতামহ ইদরিস সাহেবের তত্ত্বাবধানে বড় হচ্ছে, ক্লাস নাইনে পড়ে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছে। খালেদার ছোটবোন অর্থাৎ জাহানারার খালা নিলুফার পড়ে ক্লাস টেনে বয়সে বেশ কয়েক বছর বড়। নিলুফাব হাসিখুশি মেয়ে, সাজগোজ করতে ভালোবাসে, অনুচ্চারিত নতুন প্রেমের প্রাথমিক রোমান্সের শিহরিত হতে জানে। জাহানারা তার বিপরীত। সারা চেতনায় তার বিষণ্ণতা, সে কেবল ভাবে, কেবল মনে মনে প্রশ্ন কবে যার উত্তর কেউ তাকে দিতে চায় না। সে প্রশ্ন করে তাব মৃত পিতা সম্পর্কে, তার মৃত মাতা সম্পর্কে। মা মারা গেলে কেন, মা মারা গেল কী করে; মায়ের মৃত্যুর রহস্য যেদিন উন্মোচিত হলো সেদিন জাহানারা নিজের জীবনের' তার খালা নিলুফারেরর জীবনের সকল স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ। উপন্যাসের শেষপ্রান্তে এসে জানতে পারি যে খালেদা নিজের অভিমানকে আঁকড়ে ধরে নিজে দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ গ্লানি নীরবে সহ্য করে, যেদিন অসহ্য মনে হল সেদিন আত্মহত্যা করল। কী পরিবেশে মা আত্মহত্যা করে জাহানারা পিত্রালয়ে এসে বহুকাল পরেও তার অবিকল পুনরাভিনয় দেখল। কারণ, পুরাতন প্রবাহ সে বাড়িতে তখনও অব্যাহত। হালের পালা মেঝ চাচার ঘরে। চাচার কিশোরী মেয়ে লুৎফা ভালবাসে অন্য চাচাত ভাই মুরাদকে। এই বাড়িতে প্রেম, সুন্দর ও বীভৎসের মিলিত স্পর্শে এক বিচিত্র রূপ ধরে। লেখকের বর্ণনাও স্মরণীয় রূপে সার্থক।

মুরাদ আর কোনো কথা না বলেই নিচে নেমে গেল। সিঁড়ির ওপবেব ধাপে দাঁড়িয়েই লুৎফা পরিষ্কার শুনলো মুরাদের নিচে নেমে যাবাব শব্দ! আর শুনলো ও পাশের ঘর থেকে দোতলায় উদ্গারের পর উদ্গারে ঘরখানা তার আব্বা ভরে দিচ্ছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ নেই। নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন।

লুৎফার মা-ও সারাজীবন সহ্য করে এসে একদিন অকস্মাৎ ক্ষণিকেব উত্তেজনায় বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জনমের মতো অভাগী স্বামীকে হারায়। আরও পরে জাহানারা আবার যখন তার নানার বাড়িতে এল তখন জানতে পারল যে নিলুফারও তার স্বামী নিয়ে সুখী হতে পারে নি এবং সেও তার বোনের মতো আত্মহত্যা করেছে। তার রক্তেও যে ছিল একই অনুভূতির প্রবাহ; উপন্যাসের এই দিকটা, বিশেষ জীবনের বেদনা ও ব্যর্থতার দিকটা যতটা কলামণ্ডিত রূপ লাভ করেছে অন্যান্য অংশ ততটা সার্থক হয়নি। যেসব মেয়েদের আত্মোৎসর্গের দ্বারা এই বেদনা গাঢ়তা লাভ করে তারা নিজেরাই যথেষ্ট মুল্যবান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তাদের অনুভূতির কমনীয়তা ও সূক্ষ্মতা কখনও কখনও মধুর বলে মনে হলেও তাদের প্রণয় সম্পর্কের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে যে ঐশ্বর্য নেই যা তাদের জীবনের বিপর্যয়কে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে। নিলুফার আসাদ কিম্বা লুৎফা মুরাদ জাহানারার দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক প্রেমময় ভাবালুতার মধ্যে স্বাভাবিকতা হয়তো আছে, কিন্তু তাতে কোনো মহিমা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিন্দনীয় অসঙ্গতি পর্যন্ত আছে।

দিল আরা হাশেম : ঘর-মন-জানালা

'ঘর-মন-জানালা' লেখিকার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তবে, গ্রন্থের কোথাও প্রথম রচনার আড়ষ্টতা, ইতস্ততা বা ভারসাম্যহীনতার চিহ্নমাত্র নেই। অভিজ্ঞতাপুষ্ট পর্যবক্ষেণের দক্ষ, পরিণত মানসের অধিকারিণী লেখিকা কুশলী শিল্পীর মতো এই সুদীর্ঘ কাহিনীর ঘটনাক্রম ও পরিবেশ বিভিন্ন চরিত্রের কর্ম ও অন্তর্লোকের সঙ্গে নানারকম সূক্ষ্ম ও জটিল সূত্রে গেঁথে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কোথাও কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি নেই, এমন নয়। তবে তার বিচারও রচনার পরিণতি ও সুনির্দিষ্ট সর্বাঙ্গীণ পরিপাট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পরীক্ষাযোগ্য, অন্য মানদণ্ডে নয়।

'ঘর-মন-জানালা' একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্র। এই জীবন মূলত বৈচিত্রহীন, নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ। এখানে সুখের সীমানা আদিঅন্ত বিস্তৃত নয়। দুঃখের আলোড়নও প্রবল ও প্রচণ্ড ঘটনার অভিঘাতে উৎপাদিত নয়। এই জীবন গৃহে আবদ্ধ, মনে গুঞ্জরিত, জানালায় সংস্থাপিত। এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই লেখিকার সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রয়োগ। উপন্যাসের শেষার্ধের দু-একটি ঘটনাখণ্ডের অতিমধুর অতিনাটকীয়তা ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ সুরুচি ও পরিমিতিবোধের প্রীতিকর প্রকাশে সমুজ্জ্বল। কল্পনা কোথাও উচ্চকণ্ঠ না হয়েও নির্মম ও নিরবচ্ছিন্নরূপে বাস্তবতাসংলগ্ন। বর্ণিত জীবন গভীরভাবে সত্য ও মর্মান্তিকরূপে সত্য। এই জীবনের অন্তর্নিহিত বেদনাবোধকে লেখিকা যে সুতীব্র মমতা দিয়ে রূপায়িত করেছেন তার দাহ ও জ্বালা সংবেদনশীল পাঠক হৃদয়কেও স্পর্শ করবে।

> নাজমাদের পরিবার দারিদ্র্যের অসুস্থতার, অশান্তির। আব্বা অল্প বেতনের চাকরি করতেন, এখন সম্বলহীন। রোগা শীর্ণ দেহ। হাঁপানীতে ভোগেন।
>
> নাজমা জবাব দেবার আগেই রান্না ঘরের দরজায় একটা ছায়া পড়ল। রোগাটে, দীর্ঘ। অশান্তি সকলেরই হয় সালেহা। সকলেরই হয়। আব্বার গলাটা ফিসফিসানির মতো শোনাল, আর নাজমার মনে হল, পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।
>
> নাজমা এক এক করে সকলের মুখের দিকে চাইল। ওর মনে হল, যাদুর স্পর্শে এদের সবাই পাথর হয়ে গেছে, এদের কারো প্রাণ নেই। আব্বার পেছনে অন্ধকারে সালমা মালিশের তেলের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কোনো মাজারে প্রদীপ জ্বালাতে এসেছে সে। (পৃ. ৪১)

নাজমার আম্মার নাম সালেহা। তিনি সারাদিন খাটেন, কাঁদেন, কথা খুবই কম বলেন।

> দরজাটা আর একটু ফাঁক হলে মার মুখখানা দেখা গেল হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। লাটভাঙা ময়লা কাপড় জড়ানো মার শরীর রুক্ষ চুল। বহু ক্লান্তি আর ব্যর্থ আশার স্পর্শ লাগা, অল্প বয়সে বুড়িয়ে যাওয়া মুখখানা মার। রাতের অন্ধকারে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো মা ঢুকলেন।... লণ্ঠন কমাতে কমাতে মা একটা অবাস্তব ছায়ার মতোই আবার মিলিয়ে গেলেন দরজার অন্তরালে। (পৃ. ২০)

নাজমা আইএ পাস করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছে কুটিরশিল্পের দোকানে, মহিলা-বিক্রেতার। সেই সামান্য আয়েই গোটা সংসার চলে। ছোটবোন আসমা ক্লাস টেনে পড়ে, তার ছোটটি আরও নিচে।

প্রতিবেশী তরুণ মালেকই আপদে-বিপদে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। সাহায্য করা মালেকের স্বভাব। নীরবে কাজ করে যায়। ঘরে মাকে সাহায্য করে বাসন-মাজা মাছকোটা থেকে শুরু করে যাবতীয় গৃহকর্মে। ওর ঘর-পর নেই। নাজমাদেরও ও সব কাজ না ডাকতে করে দেয়। সময় মতো নাজমার আব্বার জন্য ওষুধ কিনে আনে, প্রয়োজন হলে বাজার করে দেয়। এসব সত্ত্বেও নাজমার মা কিন্তু মালেককে বেশি আপন করে নিতে চান না। হয়তো তিনি টের পান মালেক নিশ্চয়ই মনে মনে নাজমাকে ভালবাসে।

মালেক যে নাজমাকে ভালবাসে, সেও মালেককে গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু মালেক বড় চাপা স্বভাবের।

রাত জেগে নানা রকম বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে যা রোজগার করে তাতে মা আর ছেলের সংসার একরকমে চলে যায়; কিন্তু কেবলমাত্র এই আয়ের ভরসাতে বিয়ে করে ঘবে বৌ আনতে ভয় পায়। তার ওপব সে অমানুষ নয়, নাজমাদের গোটা পরিবারকেও সে ফেলে দিতে পারবে না। নাজমাই বা তা সহ্য করবে কন ? মালেক তাই কেবল ভাবে, মনে মনে। ঘর ভরে ফেলে হাজার রকম ফুলের টবে। ছবি আঁকে। কিন্তু ভালোবাসাব কথা প্রাণভরে প্রকাশ করার কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। নাজমা উন্মুখ হয়ে তাব জন্য অপেক্ষা করছে জেনেও পারে না।

দোকানেই নাজমার সঙ্গে জব্বার সাহেবের প্রথম পরিচয় হয়। রুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী, মধ্যবয়সী বড়লোক জব্বার সাহেব। স্ত্রী নিশাত তাকে কঠিনতম আঘাত হেনে আজ বহু বছর হল অন্যের সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়েছেন। নিজের নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে কোথাও সুখ ও শান্তির চিহ্নমাত্র খুঁজে পান না। হঠাৎ নাজমার মধ্যে এক নতুন নারীব সন্ধান পেলেন। সাধারণ শাড়িতে ঘেরা, শ্যামল, সুশ্রী, শান্ত, স্নিগ্ধ নাজমা। ওর দেহের রূপের চেয়ে ওর সত্তার নিরাবিল পবিপূর্ণতা জব্বাব সাহেবকে মুগ্ধ করে। তিনি নাজমাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। নিঃস্বার্থ নির্লোভ দরদ দিয়ে। প্রথমে স্টেনো টাইপিং-এর স্কুলে পড়বার ব্যবস্থা কবে দিলেন, পরে পাস করলে, একটা বেশি বেতনের ভদ্র চাকরি পেতে পর্যন্ত সাহায্য করলেন। নাজমাও একটু একটু করে জব্বার সাহেবের অন্তরঙ্গ হল। মালেকের ভালোবাসাকে নাজমা কখনই আপনার করতে চায়নি, নিজের হৃদয়ে সে ভালোবাসার গভীরতাও কখনও কমে নি। বরঞ্চ দিনে দিনে আরও বেড়েছে। তবুও মালেকের স্ববাবের প্রকৃতির জন্যই এই প্রেম ছিল অন্তঃশীলা, মন্থরবেগ, উত্তাপহীন। জব্বার সাহেবের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাই কখনও কখনও অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন লুব্ধতা যা অভাবের সংসারের কোনো অভাগিনী মেয়ে সর্বক্ষণ স্ববশে রাখতে পারে না।

দুঃখ ছিল আসমার জীবনেও। ও সারাদিন একটানা ঘরের কাজ করে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছে। তার রূপ অনেক, দেহ পুষ্পিত, সুন্দর। কেবল জীবন নিরানন্দ, রোমাঞ্চহীন। যদিও বাইরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় না, অন্তরে তার আগুন জ্বলে; অন্তরে সে অশান্ত হয়, অস্থির হয়। সে মুক্তি খোঁজে, সে বাঁচতে চায়। নাসরীনের ভাই আখতার

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সুদর্শন, আকর্ষণীয় তরুণ। প্রলুব্ধ করার কৌশলও জানে, দুঃসাহসী এবং কামুকও বটে। তার সান্নিধ্যের শিহরণে আসমা বিবশ হয়, ক্ষণকালের জন্য হলেও চেনাজগতের চেতনা লুপ্ত হয় বলে এর সম্মোহনকে সে অস্বীকার করতে চায় না।

> কী ঘটছে বোঝবার আগেই আখতার হঠাৎ তাকে দুহাতে শিশুর মতো পাঁজা কোলা করে উঠিয়ে নিল, তারপর দরজা বন্ধ করল পিঠ দিয়ে চেপে। আসমা এক গোছা ফুলের মতো শিথিলতায় অলস হল আখতারের আলিঙ্গনে একটুও প্রতিবাদ না করে। তার ক্রোধ, আক্রোশ, অভিমান, সব অনুভূতি, স্নায়ুর উত্তেজনা এক নিমেষে ভাসিয়ে দিল পরিপূর্ণ শিথিলতায়। আখতার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অজস্র চুমো দিচ্ছে গলায়, ঘাড়ে, মুখে। অনেক কথা বলছে চুমোর ফাঁকে ফাঁকে ফিসফিস করে। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না। উগ্র পানীয়ের মতো জ্বালা ধরাচ্ছে আখতারের স্পর্শ তার সমস্ত শরীরে আর এক মোহময় বিস্মৃতির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ছে তার সমগ্র চেতনা।
>
> হ্যাঁ আজ তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই বিস্মৃতির। এই অতলান্ত বিস্মৃতির সাগরে ও সমস্ত তিক্ত অনুভূতিকে বিলীন করে দিতে চায়। (পৃ. ১৪২)
>
> জানে আসমা, ভালো করে জানে। এর নাম ভালোবাসা নয়। হতাশায় তিক্ততায় আখতারেব সঙ্গ মদের নেশার মতো প্রয়োজনীয়, কিন্তু নেশা ছুটে গেলে প্রত্যেক মাতালের মতো আসমাও নিজেকে ঘৃণা করে, নেশাকে ঘৃণা করে। এর নাম ভালোবাসা নয়, সে জানে। অথচ সে নেশা না থাকলে সে বাঁচবে না, তাও সে জানে। আখতারের কথায় সে বুঝতে পারল, তাকে সে প্রতারণা করছে। ঈশ্বর তার অন্তরে এ কি জটিলতার জাল বুনে দিয়েছেন, ভালোবাসতে চেয়েও সে কেন ব্যর্থ হয়? (পৃ. ১৪৫)

বদ্ধ ঘরের পরিবেশ যখন প্রত্যেহের অভাব-অনটনে শ্বাসরোধকারী হয়ে ওঠে, আসমার মন তখন খোলা জানালা দিয়ে যে-কোনো মোহকরী অনিশ্চিত দূরত্বে হারিয়ে যেতে চায়। যাকে খুঁজে পায় সে আখতার। যাকে ভালোবাসা যায় না জেনেও দেহদান করে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। এবার যখন ভালোবাসার সংকল্প নিয়ে সে আখতারকে চিরকালের জন্য আঁকড়ে ধরতে চায় তখন আখতার তাকে উপেক্ষা করে নতুন কোনো সহপাঠিনীসহ মিছিলের জনপ্রবাহে মিলিয়ে যায়। তারপর একদিন সামান্য একটি পত্রে বিদায় নিয়ে চলে যায় বিদেশে।

ততদিনে আব্বার মৃত্যু হয়েছে। সেই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে একজনের অসহায়ত্ব আরেক জনের সহানুভূতিকে প্রগাঢ় করে তুলেছে; নাজমা-মালেক আরও অকপটে পরস্পরের নিকটে এসেছে। মালেকের মা মালেককে বলে বিয়ে করতে। ঘরে বৌ আনতে। মালেক বিষণ্ন হৃদয়ে সমস্যার পরিধি পরিমাপ করে এবং কখনও-কখনও দেখে নাজমা জব্বার সাহেবের গাড়িতে চড়ে যাওয়া-আসা করে। এমন সময় নাজমা জানতে পারে কুমারী ছোটবোন আসমার সন্তানবতী হওয়ার কথা। নাজমা দিশাহারা হয় এবং দিশাহারা হলে সব সময় যার কাছ থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করেছে তাকেই স্মরণ করে। মালেক যাতে আসমাকে রক্ষা করতে অধিকতর মনোবল লাভ করে সে জন্য নাজমা এক বড় রকমের প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। আসমাকে বিপদমুক্ত করার ব্যগ্রতায় নাজমা মালেককে অনুরোধ

করে, সে যেন আসমাকে বিয়ে করে। নিজের সম্পর্কে বলে যে, মালেক আঘাত পাবে বলে এতদিন সে একটা কথা প্রকাশ করে নি। নাজমা নাকি অনেক দিন থেকেই জব্বার সাহেবকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং তাকেই বিয়ে করবে বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছে।

মালেক আসমাকে বিয়ে করল এবং বিয়ের রাতেই নিরুদ্দেশ হয়। চলে যায় একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় এবং আশ্রয় নেয় পার্বত্য রমণী স্বাস্থবতী লাবণ্যময়ী তুঙ্গার গৃহে। পরে এই তুঙ্গারই দুই বিরোধী রূপের চিত্র অঙ্কিত করে মালেক একদিন দেশের সেরা শিল্প হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করে। ছবি দুটোর ক্যাপশন ছিল।

> ট্যু ফেসেস অব ইভ। শান্তি স্নিগ্ধতা আর পবিত্রতার প্রতীক একটি অপার্থিব নাবীব অবয়ব। আরেকটি কামনা, বাসনা, লালসার এক উগ্র প্রতিচ্ছবি। (পৃ. ৩৩৯)

প্রবাস জীবনে মালেক যে তুঙ্গার সম্মোহন থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল তার মূলেও হয়তো তুঙ্গা-চরিত্রের এই রূপদ্বৈত সক্রিয় ছিল।

যথাসময়ে আসমার ছেলে হয় এবং মালেকের মা সরল বিশ্বাসে পুত্রবধূ ও তাঁব সন্তান রাতুলকে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। কিন্তু ততদিনে নাজমার আত্মদহনেব পালাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে জব্বার সাহেবকে গ্রহণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা কবে এবং মালেকের জীবন ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য অন্তরে অবিবত পুড়ে মরে। প্রতি পলে পলে উপলব্ধি করে মালেককে সে কত গভীরভাবে ভালবাসত। তাকে বাদ দিয়ে নিজের জীবন কত অর্থহীন, রক্তহীন। নাজমা একআধদিন মদ খেল, জব্বার সাহেবের মোটবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। অসংলগ্ন উক্তির আঘাতে জব্বার সাহেবকে ব্যথিত ও বিভ্রান্ত করে তোলে। জব্বার সাহেবও বুঝলেন যে নাজমার অতলান্ত হৃদয়ে এমন কোনো তৃষ্ণার আগুন অনির্বাণ জ্বলছে, যা নির্বাপিত করা তাব অসাধ্য। এ দাহ থেকে মুক্তি নেই কারও। না জব্বার সাহেবের, না নাজমার। এই সময়ে একদিন, আকস্মিকভাবে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত শিল্পী মালেকের সাফল্যের সংবাদ পাঠ করে সুতীক্ষ্ণ অনুশোচনায় দগ্ধ হল এবং ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অপ্রকৃতিস্থ হল। অভিভূত ও মুহ্যমান জব্বার সাহেবও অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বিবাহের নির্ধারিত দিবসের মাত্র দুদিন আগে নাজমাকে মুক্ত করে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে দূরে কোথাও চলে গেলেন।

মালেক গৃহে প্রত্যাবর্তন করল বড় দুঃসময়ে। একদিকে নাজমা উন্মাদিনী, অন্যদিকে আসমা, সন্তানজন্মের পর থেকে রোগে ভুগে রক্তহীনতার শেষ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে থাকে, যে কান্না এখন হয়তো এক সুস্থ এবং অকৃত্রিম দুঃসহ বেদনাবোধেরই প্রকাশ।

আমরা ইচ্ছে করেই এই দীর্ঘ উপন্যাসের কাহিনীভাগ একটু বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করলাম। এতে করে রচনার বর্ণনা-রীতি, চরিত্র সৃজন, ঘটনা-গ্রন্থনের দোষ-গুণগুলোও প্রকারান্তরে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা গেল। শুধু সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য দ্বারা সকলের নিকট গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে তোলা যেত না। সংকলিত সার থেকে যা সহজে অনুমেয় তা হল এই যে লেখিকা অকারণে উপন্যাসের আয়তন দীর্ঘ করেন নি, ঘটনার যে জটা-জাল তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন তার বহু বর্ণময় পরিস্ফুটনের জন্য পরিব্যাপ্ত অবকাশ আবশ্যকীয় ছিল।

যে দু'একটি ঘটনা আমাদের পরিপূর্ণ সন্তোষ বিধান করে নি, তার মধ্যে প্রধান হল তুঙ্গাপর্ব। সমগ্র প্রসঙ্গই যেন একটু বেশি কাল্পনিকতা-মণ্ডিত এবং রুপালি পর্দার প্রভাবজাত। মালেকের প্রেসিডেন্ট পদক লাভও এই একই অর্থে মাত্রাতিরিক্তরকম শিহরণমূলক। নাজমার অনুরোধে মালেকের আসমাকে বিয়ে করা এবং পরিণামে নাজমার উন্মাদিনী হওয়ার দৃশ্যগুলোও বাহ্যত অতি প্রবল ও মর্মভেদী বলে প্রতীয়মান হলেও কাহিনীর পূর্বাপর পরিচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো একটু বেশি আকস্মিক এবং বেশি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের বিচারে এই উপন্যাসের প্রথমার্ধ দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় অধিকতর সার্থক।

তবে এসব কথা গৌণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্রান্ত। আমাদের যে সিদ্ধান্তটি মুখ্য সে হল এই যে, 'ঘর-মন-জানালা' একটি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। গত তিন-চার বছরের মধ্যে যে মাত্র দু-তিনটি উপন্যাস পাঠ করে প্রভূত পরিমাণে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছি, 'ঘর-মন-জানালা' নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি।

হাবীবুর রহমান : পুতুলের মিউজিয়াম

পুতুলেব মিউজিয়ামের রচয়িতা হাবীবুর রহমান। পূর্বপাকিস্তানে সরস এবং শোভন শিশুসাহিত্যের অভাব সকলেই অনুভব করেন। যে দু'একজন সাহিত্যিক এ ব্যাপারে এ অভাব মোচনে উদ্যোগী হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুরুচিপূর্ণ উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির সাধনা করে আসছেন, শিশু ও কিশোরদের একই সঙ্গে অনাবিল আনন্দ এবং প্রীতিকর জ্ঞান পরিবেমনের সচেষ্ট হয়েছেন তাদের মধ্যে হাবীবুর রহমান অনস্বীকার্যভাবে একজন। অল্প বয়সেব ছেলেমেয়েরা পড়বে বলেই তিনি অবহেলাক্রমে গল্প বানিয়ে যান না। অনেক পরিশ্রম করে তাদের জন্য অনেক কাজের কথা সংগ্রহ করেন, অনেক দরদ দিয়ে সেগুলোকে বসায়িত করেন এবং অতি মধুর ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ভাষায় তাকে প্রকাশ কবেন। পুতুলেব মিউজিয়ামেও এসব গুণ আছে, এবং আছে বলেই তাব আবেদন কেবল শিশুদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয। বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন, হয়তো কিছু শিখবেনও। ভূমিকায লেখক বলেছেন, 'পুতুলেব মিউজিয়াম', কিশোরদের জন্য লেখা। পুতুলেব মিউজিযাম, সবার জন্যে মিউজিয়াম, যাকে বলে ডাইনোসোর, হাতিব পরদাদা ও সবুজ বরণ চা-এই পাঁচটি পর্যায একটি মাত্র কাহিনী সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত। সেদিক দিয়ে এটিকে অখণ্ড একটি উপাখ্যান বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি পর্যায়েব কাহিনীর ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে বিজ্ঞানেব প্রতিষ্ঠিত সত্যেব মালমশলায়।

একটা নমুনা পড়ে শোনাই। বড় ভাইয়ের জবানিতে লেখক গল্প বানিয়েছেন কৌতূহলী ছোট বোনের জন্য। কথা হচ্ছিল নানা জাতের ডাইনোসোর নিয়ে। স্টেগোসরাসেব প্রসঙ্গ এসে পড়লে কথা এইভাবে এগিযে চলে :

> স্টেগোসরাসবা নাকি সব কিছু নিয়েই ভালমন্দ দু'মুখো চিন্তা করতে পারতো আর শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক কবতে পাবতো না।
>
> সে আবার কী ?
>
> এই ধরো, হয়তো মনে হলো এখন সামনে যাওয়াই ভালো, তক্ষুনি আবার মনে হলো, না বরং পেছনে যাওযাই ভালো আব শেষ পর্যন্ত এই দোমনামনি করতে করতে সামনে পেছনে কোনো দিকেই যাওয়া হলো না। ফল হলো এই, বেচারাকে না খেয়ে না দেয়ে ঐ এক জায়গাতেই হয়তো কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে হলো।
>
> ভারি মজা তো ?
>
> ... আসলে স্টেগোসরাসদের একটার জায়গায় দু'দুটো মগজ ছিল। একটা ওর মাথার আব একটা ওর লেজের গোড়ায়।... বিজ্ঞানীরা বলেন, একটা মগজ দিয়ে অমন জাঁদরেল দেহখানাকে ঠিকমতো চালানো যায় না বলেই ওদের দুটো মগজ ছিল। কথাটা ঠিকই তাই। অমন একখানা হাজারমণী দেহ— লেজ থেকে মাথার ডগা পর্যন্ত

প্রায় হাত চল্লিশেক লম্বা— তাতে এই এতোটুকু একটা মাথা, যাব মগজের খোলটা বড় জোর তার ঐ একটা মুঠোর সমান। এতটুকুন মগজ নিয়ে কী আর কাজ চলে? তাই দেহের উপরের দিকটা চালানোর ভার ঐ মগজটুকুর ওপর ছেড়ে দিয়ে লেজের গোড়াটায় খানিকটা বাড়তি মগজ দিয়ে দিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা! নইলে অমন চোঃ লেজটা বোধ হয় নড়তোই না কখনো।

বায়াজীদ খান পন্নী : বাঘ-বন-বন্দুক

বাঘ-বন-বন্দুক পড়ে বড়ই প্রীত হয়েছি। শিকারকাহিনী বাংলায় খুব কমই রচিত হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানে হয় নি বললেই চলে। নাটক, নভেল, কবিতা, উপন্যাসের বাইরে হালে রম্যরচনা জাতীয় বইয়ের প্রচার কিছু বেড়েছে। তবে এগুলোও বেশির ভাগ হয় বহির্জীবনের ভ্রমণোপাখ্যান, নয় অন্তর্লোকের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে অকস্মাৎ সরসরূপে উপস্থিত করেছে যে পঞ্চমুখে আমি তার তারিফ করতে কুণ্ঠিত নই।

কেবল যে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম বলেই বইটি প্রশংসার যোগ্য তা নয়। বইটি সুলিখিত। লেখক নিজে পাকা শিকারী এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী। লেখক নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির তাৎপর্যকে তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম। শিকারের উপকরণ ও আয়োজন, অরণ্যের সৌন্দর্য ও রহস্য, জন্তুর ভাষা ও আচরণ, বন্দুকের ব্যবহার ও প্রকরণ, শিকারীর শিক্ষা ও সাধনা প্রতিটি বিষয়ে লেখক বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। শিকারকাহিনীর শিহরণমূলক আবেদনকে ক্ষুণ্ন না করেও বাঘ-বন-বন্দুক ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সত্য উদঘাটিত করেছেন।

মযহারুল ইসলাম : কবি পাগলা কানাই

পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উদ্যোগ, অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রমনিষ্ঠা আমাদের চরিত্রায়ত্ত কিনা—এ পর্যায়ের প্রশ্ন বর্তমানে আর উত্থাপনযোগ্য নয়। মাত্র কয়েক বছরেব মধ্যে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলেই ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের অনেক বিস্তৃত বা অনাদৃত অংশ সকল সাহিত্যপাঠকের গোচরাধীন হচ্ছে, অনেক পরিচিত অংশ সম্পর্কেও গতানুগতিক ধারণাদির বিকারমুক্তি ঘটছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাঁদের 'সাহিত্যিকী' মুদ্রিত করে এই অনুসন্ধানমূলক অভিযানের প্রকাশ্য শরিক হলেন।

'কবি পাগলা কানাই' রাজশাহীর গবেষণামূলক পত্রিকা 'সাহিত্যিকী'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। বর্তমানে তার গ্রন্থাকৃতিও শোভমানতায় বিশেষ প্রীতিকর হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৪০। আলোচনামূলক ভূমিকাটি ৪৭ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কানাইয়ের ২৪০টি গানের সংকলন। এর পরের তিন পৃষ্ঠা পাগলা কানাই সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করা হয়েছে। শেষ দেড় পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী।

পাগলা কানাইয়ের এতগুলো গান এক জায়গায় দেখবার সুযোগ কবে দিয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাদেব সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। পূর্ববাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে যাঁরা এ যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রমস্বীকার করে আসছেন তাঁদের জন্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরো গভীর। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের (১৮১০-৯৫) একজন কৃতকর্ম বিষয়ক এরকম ব্যাপক পরিচয় তার রচনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্বপাকিস্তানে ইতোপূর্বে অন্য কেউ প্রচাব করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দু'একটি খণ্ডিত উদ্ধৃতিব টীকাভাষ্য হিসেবে কিছু বিচ্ছিন্ন আলোচনা বা সাধারণ তত্ত্বেব ব্যাখ্যা হয়তো আমরা লাভ করেছি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিচার ও উপলব্ধির জন্য যে জাতীয় সংখ্যাসমৃদ্ধ সঞ্চয়ন আবশ্যক হয়, ড. ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' সেরূপ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য আমবা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

পাগলা কানাইয়ের গানসমূহ ড. ইসলাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রধান গীতগুচ্ছের শিবোনাম রেখেছেন—বন্দনা বা হাম্‌দ ও নাত, মনকে, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, হেয়ালী, প্রেমের মহিমা, ইসলামধর্ম, অনিত্যতা ও মৃত্যু, ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা ইত্যাদি। এর মধ্যে দেহতত্ত্বের গানই সংখ্যায় সর্বাধিক, ২৯ থেকে ১০৫ সংখ্যক গান সবই দেহতত্ত্বমূলক। এ সকল গানে নানা রূপকে দেহের কথা বলা হয়েছে এবং দেহের রূপকে নানা গুহ্য-সাধনপ্রণালীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

চারটি আঙ্গুল দেহের মাঝে বেয়াল্লিশ হাজাব দ্বার
এক হাজাব মেরুদণ্ড রয়
কোন্ দবজায কেবা থাকে সেই কথা কও আমায়
না বলিলে বয়াতীর ছাও ছাড়বো না তোমায়

নাভির নিচে কোন্ জনা আছে
বাহাত্তর সেজদা তোমার দেহের মাঝে কোন্ জায়গায়। (৬৪ নং গান)

পাগলা কানাই পল্লীকবি এবং সাধক কবি। হৃদয়ের বাণী রূপক আকারে গীতময় করে বলাই তাঁর কবিস্বভাব। তাঁর কবিভাষা কোনো কোনো সার্থক চরণে বা স্তবকে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও সেগুলোর সাধারণ উৎস কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সাধন প্রণালীর বিধিবদ্ধ পরিভাষা। ভাবচিত্র বা রূপকল্পের যে বৈচিত্র্যের সন্ধান সেখানে পাই তার বৈশিষ্ট্য কাব্যিক নয় বাহ্যিক, তত্ত্বস্পর্শিত এবং বহুলাংশে গতানুগতিক। কোনো জনপ্রিয় স্বভাবকবির রচনা যখন সংখ্যাধিক্যে বিশালত্ব অর্জন করে তখন তার পক্ষে প্রথানুবৃত্তি বর্জন করা সম্ভব হয় না। কবি পাগলা কানাইয়ের গৌরব এই জায়গায় যে তাঁর অশিক্ষিত পটুত্ব একাধিক গানে এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছে। প্রাণমনের সজীব স্পন্দন সেসব গানকে গ্রামোত্তর ও লোকোত্তর মহিমা দান করেছে। বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কেবল আন্তরিক প্রত্যয়বোধ নয়, তাকে স্থলবিশেষে রহস্যময় তীর্যক রূপক উপমার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতেও কবি প্রয়াস পেয়েছেন। 'কবি পাগলা কানাই'য়ের বিপুল সম্ভারের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বহু না হলেও বিরল নয়। ড. মযহারুল ইসলামের দীর্ঘ ভূমিকাটি পাগলা কানাইয়ের এই কবিসত্তা ও সাধকসত্তার কোনো পূর্ণ ও সাংলগ্নিক বিবরণ হিসেবে পাঠ্য নয়। কাব্যমূল্য বিচারে ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুচিত ও অস্থির ধারণাদিই এর জন্যে দায়ী। ড. ইসলামের আলোচনা-রীতিও গবেষণামূলক বর্ণনার সাধারণ শৃঙ্খলা, মিতভাষিতা ও তথ্যানুগতির পরিপোষক নয়।

আমরা পাগলা কানাই সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থলেখক যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে স্তবস্তুতি নিবেদন করতে চান, তার সারবত্তা স্বীকারে অক্ষম। পাগলা কানাই ভাব-সাধক গ্রাম্য কবি, অশিক্ষিত কবি। এ সকল কথা লেখক নিজেই বলেছেন। স্বীকারও করেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারে বাতুলতা।" (পৃ. ৩১) কিন্তু এজন্যে ড. ইসলামের যে সংকীর্ণ ও মারাত্মক ক্ষোভ তা তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি। একাধিক জায়গায় মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রতিতুলনার আহ্বান জানিয়েছেন। 'যথার্থ মূল্য বিচার' করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'গ্রাম্য কবি হয়েও এবং উচ্চশিক্ষার আলো না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা সৃষ্টি করে গেছেন— তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক চিন্তা, শিল্প-সৃষ্টি ও ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হইতে পারে।' (পৃ. ২৬) এরপর হেম-কায়কোবাদের নিকৃষ্ট চরণ উদ্ধৃত করে পাগলা কানাইয়ের 'কাব্যব্যঞ্জনারম্ব তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন করেছেন। (পৃ. ২৯) প্রসঙ্গত আধুনিক কাব্য এবং আধুনিক নারী সম্পর্কে তাঁর যে ব্যক্তিগত অননুরাগ তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। (পৃ. ৩২, পৃ. ৩৫) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাগলা কানাইয়ের ভাবগত ঐক্য লক্ষ করেছেন। (পৃ. ২৯) বলা বাহুল্য যে, বস্তুজগত ও ভাবজগতের শিল্পরীতি ও জীবনচেতনার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমণ্ডলের কবিবর্গের মধ্যে এ জাতীয় তুলনা অহেতুক এবং ঔচিত্যবোধহীন।

ড. ইসলামের এই পর্যায়ের কোনো কোনো অভিমত পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত। যেমন, 'মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি তারই রেশ পাগলা কানাই তাঁর গানে টেনে ফিরেছেন এ কথা ঠিক—মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না।' (পৃঃ ৩১) অনাবশ্যক মুগ্ধবোধ নিয়ে তিনি যখন আরো একশেষ বিচারের অবতারণা করে বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ' যে 'ঘোরতর মানবমুখীনতা' পাগলা

কানাই তার অংশীদার, "তাঁর সারা জীবনের সঙ্গীতসাধনায় শুধু মানুষের কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানেব মূল বিষয়বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল মানুষ" (পৃ. ৩৩) ইত্যাদি, তখন আমরা বিভ্রান্ত অনুভব করি।

ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। যেমন "তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ-রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।" (২১)– এই উক্তিটি। পাগলা কানাইয়েব দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেম, গুরুবাদ এবং সর্বোপরি হেয়ালী শ্রেণীতে গানগুলো পাঠ করে তাঁকে যতটা বাউলপন্থী কোনো বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীতে আস্থাবান এক স্বতন্ত্র ভাব-সাধক কবি বলে প্রতীতি জন্মে ততটা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজগ্রাহ্য অস্থিতিস্থাপক ধর্মপ্রথার অনুসারী বলে মনে হয় না। ড. ইসলাম কর্তৃক ইসলামি গান বলে সম্মানিত একটি রচনায় আছে :

আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে
নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দিদারে ॥
পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত রল, বাকি চল্লিশ কোরআন হলো
নব্বই পারা ছিল কোরআন, হাদিসে পাওয়া গেল
ও তার দশ সেপারা কোন জায়গায় ছিল
পাক পঞ্জাতন হক নিবঞ্জন মিনকুল্লে
কোরআন কোন বস্তু হোল (১৫৩ নং গান) ॥

১৪৩ নং ও ১৪৫ নং গানদ্বয়ও এই প্রসঙ্গে পরীক্ষাযোগ্য। অন্যত্র সাধনতত্ত্বের একটি গানে আছে :

ওরে তোর কালি মা তার গুণপনা ভাল
সে স্বামীর বুকে পা দিল
সেও কথাটি সভাতে বল।
আমার মা বরকত যিনি আলীর বুকে কি পাও দিছিল!
এমন বেজাইতা মা তোর কোন্ দেশে ছিল ॥ (১২০ নং গান)

এসব পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে, পাগলা কানাইয়ের শিল্পচাতুর্যের কল্পিত জটিলতা উন্মোচনেব পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল তাঁর ধর্ম-সাধনার তত্ত্বকে তন্ন তন্ন কবে পরীক্ষা করা, তাঁর মধ্যে গুহ্য-সাধন প্রক্রিয়ার যে সকল সংকেত রয়েছে—তার মর্মোদ্ধার করা এবং অপরাপর বাউলপন্থী জীবনচেতনার সঙ্গে কানাইয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক কী ছিল তার পুনর্বিচার করা। এ ব্যাপারে ড. ইসলাম উৎসাহহীন।

পাগলা কানাইয়ের কাব্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একবার মাত্র ড. মযহারুল ইসলাম একটি প্রাসঙ্গিক তুলনার উল্লেখ করেন। সে মন্তব্যটি হলো—'পাগলা কানাইযেব সমসাময়িক কবিদেব কাব্যে ছন্দ সৃষ্টিতে বা কথার গাঁথুনি নির্মাণে এমন অপবিসীম কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আব কারো মধ্যেই ছিল না।' দুর্ভাগ্যবশত এই বিচাব যথাযথ সম্প্রসারণ [illegible] না অন্যান্য বাউল কবিদের সুনির্দিষ্ট পবিচয়ও তথ্যসমৃদ্ধরূপে [illegible] হলে [illegible] শুনেছি যে—"বাউল-গানের মূল বিষযবস্তু একটি ধর্মত[illegible] ক্রিয়াকলাপ। ইহার পবিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত অনু[illegible]

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। ..... গুরুবন্দনার পদ, শরণগতির পদ, দেহতত্ত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে মূলত প্রায় সবই সমান— ভিন্নভিন্ন কবির রচনা হইলেও ভাবকল্পনার পার্থক্য নূতনত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব বিশেষ বিশেষ কিছুই নাই।" (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃঃ ১০৯ ও ১১১) কিন্তু যেটুকু মৌলিকত্ব ও পার্থক্য আছে একজন কবির পরিচয় প্রদানকালে তা অবশ্যচিহ্নিত করে দেয়া প্রয়োজন ছিল। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে পাগলা কানাই ঠিক কোথায় কতখানি লালন শাহ, শেখ মদন, ভানু শাহ, আলীমুদ্দিন, ভেলা শাহ, হাসান, ইলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েত হোসেন প্রভৃতি সমধর্মী কবিবৃন্দ থেকে স্বতন্ত্র সেই জরুরি সংবাদটি ড. মযহারুল ইসলাম পরিবেশন করেন নি, হয়তো অনুসন্ধানও করেন নি। এই জ্ঞানাভাব যে কতটা বর্তমান সংগ্রহের শুদ্ধপাঠ বিচারকেও দুঃখজনকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা আমরা গ্রন্থের সম্পাদনা-রীতি আলোচনাকালে পরে উল্লেখ করব। 'বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর বর্নার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্য রসের' (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১) যে সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় তার সম্যক উপলব্ধির জন্যেও প্রয়োজন ছিল পাগলা কানাইকে অন্যান্য বাউল সাধক কবিদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাঁর কবি-কীর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করা।

নিছক তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পাগলা কানাইয়ের কাল নির্ণয়ের অধ্যায়টি সতর্ক অনুসন্ধান নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। এই নয়া বিচারের ফলে পূর্বতন ধারণার মাত্র দশবিশ বছরের হেরফের হলেও, নির্ধারণ প্রণালীটি নিপুণ ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রশংসার্হ। তবে পাগলা কানাইয়ের কাল, তাঁর সঠিক নাম, তাঁর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করার ফলে সমগ্র বক্তব্যে কিছু পরিহার্য শৈথিল্য, পুনরুক্তি ও অতিকথন প্রবেশলাভ করেছে। কবিজীবনীর বর্ণনা ও গান সংগ্রহরীতির ব্যাখ্যায় অবিজ্ঞানসুলভ অনেক আলাপচারিতা এই ভূমিকায় প্রশ্রয় পেয়েছে। গানের তিল পরিমাণ উক্তিকে আশ্রয় করে পাগলা কানাইয়ের শৈশব ও কবিজীবনের উন্মেষকালের যে বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে পরিণত মানসের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তা অনাবশ্যক ছিল। স্বরচিত গানের সংকেতকে অগ্রাহ্য না করেও কানাই কেন পাগলা হলো তার অপরাপর সংগত কারণ ভাবা যেতে পারে। যেমন উপেন্দ্রনাথের মতে "বাউলরা নানা কারণে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষেপা) বলিয়া অভিহিত করা হয়।" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭) 'কবি পাগলা কানাইতে উদ্ধৃত আবদুল কাদির সাহেবের মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে পাঠ্য। (পৃ ৪৫) গান সংগ্রহের ব্যাপারে ড. ইসলাম নিজের বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বলেছেন "গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে। সুতরাং মাঝে মাঝে শব্দবিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এই বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছি— যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি।' কী প্রশ্নফলকে তিনি সত্য শব্দ গেঁথে তুলেছেন তার স্বরূপ ব্যক্ত না করা পর্যন্ত আমরা নির্ভুল পাঠ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে অক্ষম।

পাগলা কানাইয়ের গান সম্পাদনায় এই অবৈজ্ঞানিকতা, অনুমাননির্ভরতা ও অতিপ্রত্যয়ের

ঘোষণা আলোচ্য সংগ্রহের গৌরবকে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মর্যাদা লাভ করতে অংশত বাধা দিয়েছে। এক, সমগ্র সংগ্রহ সম্পাদনায় কোনো সযত্ন পরিচর্যার ছাপ নেই। ২৪০টি গানের মধ্যে মাত্র প্রথম ৩০টি গান টীকা সংবলিত, বাদবাকি দুশো বেটীকা। যে পর্যন্ত টীকা যুক্ত হয়েছে সেখানেও লক্ষ করা যায় যে টীকার আয়তন ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। দুই, বেশীর ভাগ টীকায় কেবলমাত্র সারমর্ম লেখা আছে। তাও গূঢ় অর্থে নয়, মামুলি অর্থে। যেমন ১৭ নং সংখ্যক গানের টীকার দুই বাক্যের এক বাক্য হোলো "মনকে সঠিক পথে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কবি।" ২১নং গানের টীকা হোলো "গুরুর চরণকে অমূল্য ধন মনে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি।" ইত্যাদি। অর্থাৎ গানের যে তাৎপর্য অনামনস্ক শ্রোতার কাছেও বোধ্য তাকেই টীকায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে অংশ অবোধ্য বা দুর্বোধ্য টীকাকার তাকে নজরের মধ্যেই আনতে চাননি। যেমন ১৮নং গানের টীকা হোলো "কবি জীবননদীর ঘাটে কুম্ভীরের কথা বলেছেন— সে ঘাটে নামতে হলে গুরুভজনা করে কুম্ভীরকে বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে।" কবি যে কুম্ভীরের কথা বলেছেন তা হরফজ্ঞানী মাত্রেই লক্ষ করে থাকবেন কিন্তু সেই জ্ঞানালোকে কি ঐ গানের—

ঘাটে নামলে মরা মানুষ— কুম্ভীর হয় বেহুঁস
ও সেই কুম্ভীর ধাইয়া কুম্ভীর খাইছে–ও তার কি
জরা মৃত্যু আছে ?
তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুম্ভীর রয়
তাজা দেখলে ধইরা খায় মরা দেখলে দৌড়িয়া পলায়
পাগল কানাই কয় ও মন সাধু
আজ কেন হলি বুধু। (১৮ নং গান)

—এই স্তবকটির অর্থোপলব্ধি ঘটে? টীকায় যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল তা অনুপস্থিত। তিন, কোনো কোনো টীকায় নির্দেশিত অর্থ মূল গানের অপব্যাখ্যাও বটে। ১৬ নং গান দ্রষ্টব্য। চার, টীকায় শব্দার্থ-নির্দেশও সুশৃঙ্খল ও সামগ্রিক নয়। যেমন ১৯ নং গানের টীকায় 'বাকসা' শব্দের অর্থ দেয়া আছে। কিন্তু চিনা বুরুজ কুমপুনী কিম্বা ১৯ নং গানের বুধু শব্দের অর্থ কী তা বলে দেয়া নেই। হন্তে যে হইতে, সকুতলে যে সকৌতূহলে তা উল্লেখ না করলেও ততো ক্ষতি ছিল না, কারণ চরণের মধ্যে এগুলোর অর্থ আধুনিক পাঠকের কাছেও একেবারে অকল্পনীয় নয়। বিভিন্ন গানের 'মনরে রসনাম্ব, 'অধর চাঁদ', 'আগরাত খাগরাত', 'চানকা কাটা' ইত্যাদি বাক্যাংশের ভাষাগত ও তত্ত্বগত রূপ কী কারণে টীকায় আলোচনার অযোগ্য বোঝা গেল না। পাঁচ, টীকার দ্বিতীয় বাক্যটি অনেক সময়েই সংগৃহীত গানের শুদ্ধপাঠ সম্পর্কে লেখকের অপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়ের ঘোণা মাত্র। যেমন— "আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত গানে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর– তাঁর গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে হয়।" (১৭ নং গান), "এ গানও মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ করেছেন— কিন্তু আমার গানের সাথে তাঁর গানের পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে আমি যথার্থ মনে করি।ঃ (১৫নং গান)। আমরা কী করে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি সে পরামর্শদানে টীকাকার সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্বচিৎ এক-আধ স্থলে পাঠ নির্ণয়ে অনুসৃত নীতির যে উল্লেখ করেছেন তা দোষণীয় নয়। ভূমিকায় তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আরেকটি উদাহরণ– "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করেছেন— কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর। শব্দ চয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধৃত গানটাই অধিক সঙ্গত।" শব্দ চয়নের কী বৈশিষ্ট্য কানাইকে চিনিয়ে দিল সে কথা ড. ইসলাম গোপন রাখলেন কেন ? ছয়, কোনো

কোনো গানের টীকায় কানাই সম্পর্কে এমন মন্তব্য আছে যা সহজেই অন্য গানের উদ্ধৃতির দ্বারা নাকচ করা চলে। ৩ নং গানের টীকা "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে (পৃ. ৮০২) প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য সেখানে সর্বত্র খেজ্‌র স্থান কালা (কৃষ্ণ) শব্দ রয়েছে। পাগলা কানাইয়েব গানে কোথাও এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই। বিশেষ কবে কোরানে আল্লাহ কৃষ্ণেব প্রশস্তি কবেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে পারেন না। সুতরাং মুসলমানি গানও কিভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ তারই এক নিদর্শন। এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" বর্তমান গানের অপর পাঠের মতো না হলেও পাগলা কানাই যে কোনো কোনো গানে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি ব্যক্ত করেছেন তা ড. ইসলামেব সংগ্রহ থেকেও প্রমাণ করা যায়। যেমন,

পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে
প্রেম কেউ ছাড়ো না
কৃষ্ণ-প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না
এই সংসার থাকতে মর্ম
এই সংসার থাকতে ধর্ম
প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না। (১৩৫ নং গান)

সাত, গানেব বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ একাধিক ক্ষেত্রে অসম। ইসলামধর্ম সম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করা ১৪৩ নং, ১৪৫ নং, ১৪৬ নং, ১৪৭ নং, ১৫০ নং, ১৫১ নং ১৫৩ নং গান এত স্পষ্টতই অনৈসলামিক যে শিরোনামে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে ভ্রম হয়। দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও হেয়ালী পর্যায়ের অনেক গানের শ্রেণীকরণে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে তার কার্যকাবণ গানগুলো পাঠের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আট, ভূমিকাব কিছু কথা কিংবদন্তীব পবিচ্ছেদে যুক্ত হতে পারতো। নয়, সমগ্র গ্রন্থে তত্ত্ব ও তথ্যেব আশানুযায়ী সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায় না। অধিকন্তু যেটুকু আছে তাব উৎস নির্দেশ নিতান্তই নিয়মবিবহিত। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য। অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সে তালিকায় অনুপস্থিত! গ্রন্থোল্লেখ থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদক বা লেখকেব নাম প্রকাশের স্থান ও কাল বাদ পড়েছে। দশ, গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্যে চমৎকাবিত্ব থাকলেও আমরা বলতে বাধ্য যে এর আন্তরসজ্জা আবো সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন হলে পাঠসুখ বৃদ্ধি পেতো। কোনো কোনো পংক্তি যে কেবল অনাবশ্যক রকম বড় হবফে ছাপানো হয়েছে তাই নয, সঙ্গে নিম্নবেখও যুক্ত কবা হযেছে। যেমন—"যে গানগুলোব নিচে কোনো নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত।" (পৃ. ৪৭) বিভিন্ন শ্রেণীর গানেব শিরোনাম কখনো পৃষ্ঠাব উপবে কখনো নিচে এমন বেনিযমে ছাপা হযেছে যে তার সংকেত থেকে পাঠ্যকালে ফয়দা ওঠানো কঠিন।

ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা হযতো কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলো। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থটিকে মূল্যহীন প্রমাণিত কবা মোটেই আমাদেব অভিপ্রায় নয়। লেখক সুপণ্ডিত এবং বহুজনমান্য। এজন্যে তাঁর সামান্য বিচ্যুতিও আমবা নজবেব বাইরে ফেলে বাখতে রাজি হইনি। নতুবা বইটি যে তিশয় মূল্যবান, এব সংগ্রহের অংশ যে কেবল পল্লীসাহিত্য রসিকেব জন্য নয়, পল্লীসাহিত্যের প্রকৃত গবেষকদেব জন্যে বত্নখনিস্বরূপ সেকথা আমবা আলোচনার সূচনাতেই উল্লেখ কবেছি।